গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৯ বর্ষ ২৭ সংখ্যা ২৩ ফেব্রুয়ারি - ১ মার্চ ২০০৭ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

দেশিবিদেশি পুঁজির স্বার্থে সিপিএম জমির ঊর্ধ্বসীমা তুলে দিতে চাইছে

বহু রক্তঝরা কৃষক আন্দোলনের পথ বেয়ে এ রাজ্যে চালু হয়েছিল 'জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন।' ক্ষমতায় পাকাপাকিভাবে বসার পর, নব্বই দশকের শুরু থেকে তা সংশোধন করে করে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যই ক্রমাগত ব্যর্থ করে দিতে থাকে।

কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেবার পাকা ব্যবস্থা এবার তারা করেছিল নতুন আর একটি সংশোধনী এনে। বিধানসভার গত সংক্ষিপ্ত অধিবেশনেই ভূমিসংস্কার আইনের এই সংশোধনীটি পাশ করিয়ে নিতে তৎপর হয়ে উঠেছিল সিপিএম নেতৃত্ব। ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদলকে না জানিয়ে এভাবে গোপনে আইন বদলের চেষ্টার বিরুদ্ধে শরিকরা আপত্তি তোলায় বিলটি বিধানসভায় সিলেক্ট কমিটিতে যাবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। আসন্ন বাজেট অধিবেশনে এই সংশোধনী পাশ করাতে ব্যগ্র সিপিএম আবার শরিক দলগুলির বাধার মুখে পড়েছে। সিলেক্ট কমিটির সভাতেও ঐকমত্য হয়নি। সিপিএম নেতাদের আচরণ থেকে বোঝা যায়, এই সংশোধনী পাশ করাতে তারা বদ্ধপরিকর। কেন ও কাদের স্বার্থে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার এ কাজটি করতে চাইছে তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা দরকার। প্রস্তাবিত এই আইনে বলা হয়েছে —

"শিল্প, বাণিজ্য, বা পরিকাঠামো, অথবা চা-বাগান, মিল-ফ্যাক্টরি স্থাপনের জন্য দরকার।" সারকথা হ'ল, এই সংশোধনীর ফলে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা শিল্পস্থাপন, ব্যবসাবাণিজ্য (মনে রাখতে হবে, আবাসনও একটা বড় বাণিজ্য), পরিকাঠামো ইত্যাদির জন্য যত খুশি কৃষি-অকৃষি জমির মালিক হতে পারবে। রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হবে ঠিকই, কিন্তু সেটা কোন বাধা নয়। অনুমতি দেওয়ার জন্য বুদ্ধদেববাবুর রাজ্য সরকার এক পায়ে খাড়া।

এ রাজ্যে জমিদারি প্রথার বিলোপ হয়েছিল ১৯৫৩ সালে। জমিদারি প্রথা বিলোপের পর চালু হয় পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন, ১৯৫৫। এই আইনে মধ্যস্বত্বপ্রথায় যারা প্রজা ছিল তাদের সরাসরি জমির মালিক বলে ঘোষণা করা হয়, জমিদারের হাতে ন্যস্ত জমি 'খাস' করা হয়, অর্থাৎ সরকারের ঘরে কালেক্টারের ১নং খতিয়ানভুক্ত করা হয় এবং জমির মালিকানার সিলিং অর্থাৎ ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এই সিলিং আইনের ত্রুটি হ'ল — সিলিং ছিল ব্যক্তিভিত্তিক, অর্থাৎ একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ২৫ একর (৭৫ বিঘা) জমির আইনসঙ্গত মালিক হতে পারত। আইনের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গ্রামবাংলার জোতদার-মহাজনেরা কংগ্রেস সরকার ও পুলিশ-প্রশাসনের মদতে বিপুল পরিমাণ জমি নিজেদের আত্মীয়স্বজন, বাড়ির কাজের লোক, এমনকী কাজের লোকের আত্মীয়স্বজন ইত্যাদির নামে বেনাম করে রাখত। ফলে আইনি পদ্ধতিতে এই জমি উদ্ধার করা একরকম অসম্ভব ছিল। এই পরিস্থিতিতে গ্রামবাংলায় গড়ে তোলা হয়েছিল, 'বেনাম জমি উদ্ধার' আন্দোলন। গৌরবোজ্জ্বল এই কৃষক আন্দোলনের ফলে সেদিন ১০ লক্ষ একরের বেশি কৃষিজমি জোতদার-মহাজনদের কাছ থেকে উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল।

বণ্টিত এই জমিকে আইনসঙ্গত করার জন্য এরপর প্রণয়ন করা হয় পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার (সংশোধনী) আইন, ১৯৭১। এই আইনে বলা হয় —

(ক) কৃষি ও বাস্তুজমি একত্র করে জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করা হবে। অকৃষি জমি সিলিং আওতার বাইরে থাকবে।

(খ) সিলিং হবে পরিবারভিত্তিক। পরিবার যত বড় হবে, তত বেশি জমি রাখা যাবে। তবে এই জমির পরিমাণ কোনমতেই ৭ হেক্টরের বেশি (১ হেক্টর = ২.৪৭১ একর) হওয়া চলবে না।

(গ) সেচযুক্ত এলাকা থেকে অসেচ এলাকায় জমির সিলিং হবে ৪০ শতাংশ বেশি।

এই আইন পাশ করার পর আরও বেশ কিছু কৃষিজমি বিলিবন্টনের জন্য সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল।

এরপর পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনের আর

দুয়ের পাতায় দেখুন

অবিলম্বে বাসের ভাড়া কমাতে হবে

— প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৫ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন — অল্প কিছুদিন আগে পেট্রল-ডিজেলের লিটার পিছু ১ টাকা মূল্য হ্রাস সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে বাস-ট্যাক্সি-লঞ্চের ভাড়া কমানো হয়নি। তেলের দাম সামান্য বাড়লেই এ রাজ্যে কোন হিসাব ছাড়াই প্রচুর ভাড়া বাড়ানো হয়। এ অবস্থায় ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে পেট্রল ও ডিজেলের দাম লিটার পিছু যথাক্রমে ২ টাকা ও ১ টাকা কমানোর ফলে অবিলম্বে বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি ও লঞ্চের ভাড়া কমানোর জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি। বাস, মিনিবাস, ও লঞ্চের ভাড়া ২ টাকা করে এবং ট্যাক্সির ভাড়া ২৫ শতাংশ কমাতে হবে।

চটকল মালিকরা এই ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে কীসের জোরে

রাজ্যের আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিকের ধর্মঘট ৫০ দিন হতে চলল, অথচ শ্রমিকদের আইনসঙ্গত দাবিদাওয়ার সুরাহা করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কোনও সদর্থক ভূমিকাই নিচ্ছে না। শ্রমিকদের মধ্যে প্রশ্ন উঠছে, মালিকরা আইনের মাথায় পদাঘাত করে যাবে, অথচ সরকার তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাটিও নেবে না, মালিকরা শ্রমিকদের পিএফ-ইএসআই-গ্র্যাচুইটির টাকা মেরে দেবে, আর সরকার তার পৃষ্ঠপোষকতা করেই যাবে, তাহলে এই সরকারকে শ্রমিকের কী প্রয়োজন ? সরকারের প্রশ্রয় না পেলে মালিকরা এই ঔদ্ধত্য দেখাতে পারত কি ? প্রশ্ন উঠছে জেলাশাসকের ভূমিকা নিয়েও। গ্র্যাচুইটির টাকা আদায় করার দায়িত্ব তার। কিন্তু জেলাশাসকরা মালিকদের জন্য কৃষিজমি দখল করতে যত তৎপর, শ্রমিকদের ইএসআই আদায়ে ততটাই উদাসীন। সরকারের এই নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদ জানিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকদের ২০টি সংগঠন যৌথভাবে প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অতি দ্রুত হস্তক্ষেপ করার দাবি জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই ধর্মঘটের সঙ্গে শুধু আড়াই লক্ষ শ্রমিকই নয়, ৪০ লক্ষ পাটচাষীর স্বার্থ জড়িত। সুতরাং সরকার ধৃতরাষ্ট্র হয়ে বসে থাকতে পারে না। ১৪ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় শ্রম কমিশনার শ্রমিক শোষণের ভয়াবহ বিবরণ শুনে স্বীকার করে নেন যে, চটকল মালিকরা শ্রমআইন মানছে না, ত্রিপাক্ষিক চুক্তিও মানছে না। এজন্য আইন মোতাবেক ব্যবস্থা করবেন বলে তাঁরা প্রতিনিধিদের জানিয়েছেন। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর কাছে চটকল মালিকপক্ষ যে ১৫০ পয়েন্ট ডিএ দিতে রাজি হয়েছিল, তার থেকে কিছুটা বাড়িয়ে কোনও মীমাংসাসূত্র বের করা যায় কি না, তা ভেবে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী ও শ্রম কমিশনার দিল্লির বৈঠকে শ্রমিক প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানান। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদক দিলীপ ভট্টাচার্য এ বিষয়ে বলেন, আইনঅনুযায়ী ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে কোন মীমাংসা হতে পারে না। কারণ মালিকরা কার্যত ওয়েজ-ফ্রিজ করতে চাইছে। বৈঠকে সিটুর পক্ষে মহম্মদ আমিন, এ আই টি ইউ সি-র পক্ষে গুরুদাস দাশগুপ্ত, আই এন টি ইউ সি-র পক্ষে গণেশ সরকার, বি এম এস-এর পক্ষে বৈজনাথ রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে মালিকপক্ষ যথারীতি আর্থিক অসচ্ছলতার বাহানা তোলে। মালিকদের এই বক্তব্যের তীব্র বিরুদ্ধতা করে কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন, মালিকদের আর্থিক অবস্থা যদি খারাপই হবে, তাহলে গত কয়েক বছরে তারা পশ্চিমবঙ্গে নতুন নতুন জুট মিল খুলছে কী করে ?

সাতের পাতায় দেখুন

ইতিপূর্বে মহামিছিলের দিন ১৫ ফেব্রুয়ারি ছিল, কিন্তু রাজ্যব্যাপী প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য তা পিছিয়ে ৯ মার্চ করা হয়েছে

এ আই ডি এস ও'র অষ্টম পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন

গত ৩-৪ ফেব্রুয়ারি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহরে অনুষ্ঠিত হ'ল এ আই ডি এস ও'র পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন। ৩ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য সমাবেশের দিনে প্রায় ৩ হাজার ছাত্রছাত্রীর মিছিল শহর পরিক্রমা করে প্রকাশ্য সমাবেশের স্থল এ'টিম গ্রাউন্ডে যখন উপস্থিত হয়, তার আগেই আরও বহুদিক থেকে আসা ছাত্র মিছিলে মাঠ প্রায় অর্ধেক ভর্তি। অতীত দিনে যাঁরা ডি এস ও সংগঠনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারগুলিও তখন ভর্তি। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর এস ইউ সি আই পুরুলিয়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ভাস্কর ভদ্র বক্তব্য রাখেন। বিশেষ অতিথি অধ্যাপক আজিজুল হক নতুন উদ্দীপনায় পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলনে নিজেদের নিয়োজিত করার আহ্বান জানান। প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধান অতিথি এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য এবং শিক্ষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড তপন রায়চৌধুরী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতির নানা দিক বিশ্লেষণ করে দেখান, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের মধ্য দিয়ে কীভাবে শাসকশ্রেণী শিক্ষার মর্মবস্তুকেই ধ্বংস করে মানুষ গড়ার প্রক্রিয়াটিকেই বন্ধ করতে চাইছে। স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করা ও গ্রেডেশান প্রথা চালু করা এই চক্রান্তেরই অঙ্গ। এস ইউ সি আই পুরুলিয়া জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মানুষের আন্দোলনের শিক্ষাকে তুলে ধরে পুরুলিয়া জেলার অকৃষি জমিতে শিল্পস্থাপনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এ আই ডি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী বলেন, পুরুলিয়া জেলায় এ আই ডি এস ও প্রায় সমস্ত কলেজেই লড়ছে, রঘুনাথপুর কলেজে এ আই ডি এস ও ছাত্র সংসদে জয়ী হয়েছে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অঞ্জনাভ চক্রবর্তীও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক কমরেড পরীক্ষিত গঁরাই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় জি ডি ল্যাঙ ইনস্টিটিউশনে প্রতিনিধি অধিবেশনের প্রাক্কালে প্রাক্তন এ আই ডি এস ও সদস্যরা স্মৃতিচারণ ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এ আই ডি এস ও সদস্যরা একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। মূল প্রস্তাব সহ মোট ৮টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড নভেন্দু পাল, সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী এবং এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। কমরেড সোমনাথ কৈবর্তকে সভাপতি এবং কমরেড সৌরভ ঘোষকে সম্পাদক করে ৩৮ জনের জেলা কমিটি ও ১০২ জনের কাউন্সিল নির্বাচিত হয়।

সুন্দরবনের সংগ্রামী নেতা কমরেড মদন তাঁতির জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বহু রক্তক্ষয়ী চাষী আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা কমরেড মদন তাঁতি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৩১ জানুয়ারি ভোরে কলকাতার হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

জমিদারের অত্যাচারে জমি-ঘর সব হারিয়ে শৈশবকালেই কমরেড মদন তাঁতি পরিবারের সাথে দেউলবাড়ি অঞ্চলে দুর্গাপুর গ্রামে মামার বাড়ি চলে আসেন। ১৯৫২ সালে এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিশিষ্ট জননেতা প্রয়াত কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর বক্তব্য শুনে কমরেড তাঁতি অনুপ্রাণিত হন। ঐ অঞ্চলের পার্টি সংগঠক শহীদ কমরেড সুধীর হালদারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার মধ্য দিয়ে দলের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে পাথেয় করে তিনি বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলার কঠিন সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। অন্যদিকে, দলের ডাকে সাড়া দিয়ে গোপালগঞ্জ, রাজাপুর-করাবেগ, চালতাবেড়ে, বামুনগাছি, খাকুড়দহ-জাঙ্গালিয়া, বেলেদুর্গানগর প্রভৃতি অঞ্চলে গরিব মানুষকে বহু আন্দোলনে সংগঠিত করেছিলেন। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তিনি দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য স্তরে নিজেকে উন্নীত করেছিলেন।

দেউলবাড়ি অঞ্চলে জোতদারদের ১২০০ বিঘা বেনাম জমি রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে পায়োনিয়ার সল্ট কোম্পানি গ্রামের মানুষের উপর অত্যাচার শুরু করেছিল। এর প্রতিরোধে ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট পার্টি সংগঠক কমরেড সহদেব মণ্ডলের নেতৃত্বে গরিব মানুষের যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাতে কমরেড মদন তাঁতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। কাঁটামারি স্কুল, যা বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে, তার প্রতিষ্ঠাও কমরেড সহদেব মণ্ডল ও কমরেড মদন তাঁতির কঠোর পরিশ্রমের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। দেউলবাড়ি হাটে এক সময় জোতদারদের মদতে কংগ্রেসের লোকজন গরিব মানুষকে হয়রান করত, মারধোর, অত্যাচার চালাত। যার ফলে গরিব মানুষের পক্ষে হাটে যাওয়াই দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রেও দলের নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলন করে তাঁরা অত্যাচার বন্ধ করান এবং নতুন করে হাট প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে কাঁটামারি হাট নামে পরিচিত। একইভাবে সিপিএম সরকারে বসার পর, যখন গরিব মানুষের দল এস ইউ সি আই-এর সংগঠন ভাঙার জন্য সিপিএম ক্রিমিনাল বাহিনী গরিব মানুষের উপর নতুন করে আক্রমণ শুরু করে, তার বিরুদ্ধেও কমরেড মদন তাঁতি লড়াই করেছেন। জীবনব্যাপী জনগণের স্বার্থে এই সংগ্রামী ভূমিকার জন্যই তিনি গরিব মানুষের অত্যন্ত প্রিয়জন হয়েছিলেন। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর হার্টের অসুখে ঘরবন্দী হয়ে পড়লেও সাধারণ মানুষের সমস্যা, দলের আন্দোলন ও নানা কর্মসূচি সম্পর্কে খোঁজ রাখতেন এবং কর্মীদের পরামর্শও দিতেন।

৩১ জানুয়ারি কমরেড মদন তাঁতির মৃত্যুসংবাদ পৌঁছাতেই রাজ্য ও জেলা অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়। তাঁর মরদেহ হাসপাতাল থেকে দলের রাজ্য অফিসে নিয়ে আসা হয়, সেখানে মাল্যদান করেন দলের রাজ্য অফিস সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষ। এরপর জয়নগরে জেলা অফিসে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রয়াত কমরেডের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করেন জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস্ গোপাল বসু, পাঁচু নস্কর, কুলতলি কেন্দ্রের বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার এবং সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। কমরেড মদন তাঁতির স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি।

কমরেড মদন তাঁতি লাল সেলাম

কৃষিও বৃহৎ পুঁজির মৃগয়াক্ষেত্র হবে

একের পাতার পর

একবার গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করা হয় ১৯৮১ সালে। এই সংশোধনীতে সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়, তা হ'ল — সব ধরনের জমিকেই, অর্থাৎ কৃষি-অকৃষি-চা-বাগান-মিল-ফ্যাক্টরি-পোল্ট্রি ইত্যাদিতে ব্যবহৃত জমিকে সিলিং-এর আওতাভুক্ত করা হয়। এর ফলে আশা করা গিয়েছিল, বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি সরকারের হাতে ন্যস্ত হবে। তৎকালীন ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী বিনয় চৌধুরীও এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন —

''পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি দখল আইন নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল, তখন যে তথ্য পরিবেশন করা হয়, তাতে বলা হয়, ১৮ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ একর বাড়তি জমি পাওয়া যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, তখন পরিবারভিত্তিক ঊর্ধ্বসীমা ছিল না এবং কৃষিজমির ঊর্ধ্বসীমা ছিল সেচ এলাকায় সাড়ে ১২ একর এবং অসেচ এলাকায় ১৭.৫ একর। অতএব বাড়তি জমি অন্তত ৩০/৩৫ লাখ একর হওয়া উচিত।'' (ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধনী প্রসঙ্গে মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরীর বিবৃতি, রাজস্ব পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ১লা মে, ১৯৮১)। কিন্তু মন্ত্রী বিনয়বাবু আশা যাই করে থাকুন না কেন, ঘটনা হ'ল নতুন সংশোধনীর ফলে এক ছটাকও বাড়তি কৃষিজমি তাঁর সরকার অধিগ্রহণ করেনি। এটা আমাদের মনগড়া অভিযোগ নয়। রাজ্য সরকার নিয়োজিত মুখার্জী-ব্যানার্জী কমিশনের (১৯৯৩) রিপোর্টেই একথার প্রমাণ মিলবে।

তাহলে প্রশ্ন হ'ল, এত বিপুল পরিমাণ জমি — যা খাস হয়ে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করার কথা ছিল তা ভোগদখল করছে কারা? উত্তর, একটাই — তাদের সাবেক মালিকরা, জোতদার-মহাজনরা। শুধু তাই নয়, গণআন্দোলনের চাপে যে জমি উদ্ধার করা হয়েছিল, সিপিএম ফ্রন্ট সরকার তারও একটা অংশ জোতদার-মহাজনদের হাতে তুলে দিয়েছে। মুখার্জী-ব্যানার্জী কমিটির রিপোর্ট বলছে — ''এই বিশাল পরিমাণ জমি বেআইনিভাবে আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রে অশুভ বোঝাপড়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না''(পৃঃ ২৬)। সিপিএম সরকারের এই ভূমিকাই প্রমাণ করে, ভূমি সংস্কারের কথা ওরা যত জোরগলায় প্রচার করুক না কেন, বেনাম জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করার ক্ষেত্রে সিপিএম সরকার ততটা আন্তরিক ছিল না।

যাইহোক, যত দিন যায়, সিপিএমের সাথে দেশি-বিদেশি পুঁজির মালিকদের সখ্যতা ততই জোরদার হতে থাকে। সিপিএম নেতারা ক্রমশই বুঝতে থাকেন, ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে মালিকদের আশীর্বাদধন্য না হলে চলবে না। দেশি-বিদেশি পুঁজির মালিকরাও প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে বেশি বেশি করে বুঝতে থাকেন — 'সিপিএম' মার্কা বামপন্থায় ভয়ের কিছু নেই। বরং এতে সুবিধা অনেক। লালঝাণ্ডা দেখিয়ে শ্রমিক-কৃষককে প্রতারিত করা যাবে, বামপন্থার ঝাণ্ডা উড়িয়ে শোষিত মানুষকে দমন করা যাবে, আবার এদের দুষ্কর্ম দেখিয়ে 'কমিউনিস্টরা কত খারাপ' সেটাও প্রমাণ করা যাবে। সুতরাং সুবিধা অনেক। দু'য়ের এই প্রয়োজন পরস্পরকে কাছে নিয়ে আসতে থাকে। তার প্রতিফলন আমরা রাজ্য সরকারের ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধনীর মধ্যেই বারবার দেখতে পেয়েছি।

নয়া আর্থিক নীতি ও বিশ্বায়নের পথ বেয়ে রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে জমির ঊর্ধ্বসীমা আইনের পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছিল দেশি-বিদেশি পুঁজির মালিকরা। বিশ্বব্যাঙ্ক ১৯৯১ সালে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে 'সংস্কারের' উদ্দেশ্যে যে একগুচ্ছ প্রস্তাব পাঠিয়েছিল তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, 'জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন' তুলে দেওয়া। বিশ্বব্যাঙ্ক আরও বলেছিল, ''কর্পোরেট সেক্টর যাতে বৃহৎ জোত গড়ে তুলতে উৎসাহ পায়, এজন্য জমির ঊর্ধ্বসীমা আইনের সংস্কার দরকার।'' (বিজনেস ইন্ডিয়া, ডিসেঃ ১৯৯৩) এই সুরে সুর মিলিয়ে ভারতের একচেটিয়া পুঁজির সংগঠন 'এ্যাসোচ্যাম' বলেছিল, 'আমাদের ভূমি সংস্কার নীতির উপযুক্ত সংশোধন দরকার।'

ওদের এই পরিবর্তনের দাবিকে বাস্তব রূপ দিতে তখন থেকেই সিপিএম সরকার আসরে নেমে পড়ে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন — ''মুক্ত অর্থনীতির ফলে কৃষিকাজে পুঁজি বিনিয়োগের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। তাই পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনের সংশোধন দরকার।'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১.৫.৯৭)। সেই থেকেই শুরু। আইনের সংশোধন শুরু হতে থাকল। ভূমি সংস্কার আইনের ১৪ (জেড) ধারার সংশোধন ঘটান হ'ল। খাদ্যশিল্প, রাবার চাষের জন্য সিলিং-ঊর্ধ্ব জমি রাখার ব্যবস্থা করা হ'ল। এইভাবে ২০০০ সালে আবার ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধন করল সিপিএম সরকার। এতে সিলিং-ঊর্ধ্ব জমি রাখার সীমা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। বলা হ'ল — মিল, ফ্যাক্টরির জন্যও সিলিং ঊর্ধ্ব জমি রাখা যাবে। শুধু তাই নয়, ভূমি সংস্কারের চ্যাম্পিয়ান রাজ্য সরকার এবার বর্গাদার উচ্ছেদের বন্দোবস্ত করে ফেলল। সংশোধিত আইনে বলা হ'ল — ''বর্গাদার রয়েছে এমন জমিতেও যাতে শিল্পস্থাপন ত্বরান্বিত করা যায়, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন, ১৯৫৫-র ২০বি ধারা সংশোধন করা হ'ল।''

কিন্তু এতসব করেও পুঁজির মালিক প্রভুদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারছিল না বুদ্ধদেববাবুদের সরকার। সঞ্চিত অলস পুঁজির চাপে পুঁজির হাঁসফাঁস অবস্থা। শেয়ার বাজারে ফাটকা খেলায় পুঁজি নিয়োগ করা ছাড়া এই অলস পুঁজি বিনিয়োগের অন্য কোন উপায় নেই। রিয়েল এস্টেটের (আবাসন) ব্যবসায় পুঁজি নিয়োগ করে তারা খানিকটা বাঁচতে চায়। কিন্তু এজন্য দরকার প্রচুর জমি। তাই সরকারের কাছে ওরা বারবার দাবি জানাচ্ছিল — 'জমি দাও, ইচ্ছামতো পছন্দমতো জায়গায় প্রয়োজনমত জমি কমদামে দাও' এবং এজন্য প্রয়োজনে 'আইন পাল্টাও।' এই আইন পাল্টানোর কাজটাই সিপিএম সম্পন্ন করতে এগিয়েছে। কেন আইন পাল্টানো হচ্ছে, একথা জানিয়ে বিলে বলা হয়েছে — ''কোনও ব্যক্তি শিল্প, বাণিজ্য অথবা পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ঊর্ধ্বসীমা ছাড়িয়েও জমি সংগ্রহ করতে, দখলে রাখতে ও হাতবদল করতে পারবেন।''

আইনের এই পরিবর্তনের পর 'জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন' বলে আর কি কিছু থাকে ? এতো এককথায় গ্রামবাংলার জমি দেশি-বিদেশি পুঁজির মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া। এই আইনের বলে রিলায়েন্স এখন গ্রাম বাংলায় হাজার হাজার একর জমি কিনে বৃহৎ জোত গঠন করবে, অসংখ্য জায়গায় কৃষি বিপণন কেন্দ্র খুলে সার-বীজ থেকে শুরু করে উৎপন্ন কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসা করবে। টাটা-সালিম-ডি এল এফ, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা, পেপসি ইত্যাদি কর্পোরেট সংস্থা প্রয়োজন মত জমি কিনবে — কেউ করবে দু'একটা পুঁজি প্রধান কারখানা, কেউ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কেউ উপনগরী, কেউ বা অন্য কিছু। সব মিলিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ উচ্ছেদের কবলে পড়বে, কর্মহীন হয়ে পথে পথে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। কেউ বা আত্মহত্যা করে জীবনযন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে চাইবে। ক্ষমতাসীন বাম ও দক্ষিণ — সব দলই পুঁজির এই প্রয়োজনকে রূপ দিতে আসরে নেমে পড়েছে।

দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে সিপিএমকে কাজ করতে দেখে মার্কসবাদকে ভুল বুঝবেন না

মেদিনীপুরের জনসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

[কৃষিজমি দখল প্রতিরোধে রাজ্যব্যাপী প্রবল গণআন্দোলনের পটভূমিতে, এস ইউ সি আই-এর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, আন্দোলনের ইস্যুগুলি সম্পর্কে বিশ্লেষণ, আন্দোলন পরিচালনার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়গুলি রাজ্যের জনগণের সামনে পরিষ্কারভাবে রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি সকল জেলায় কেন্দ্রীয় জনসভা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যে সকল জেলাতেই সভা হয়েছে, রাজ্য নেতারা সেইসব সভায় বলেছেন, তার সংবাদও গণদাবীতে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং কলকাতার বেহালার জনসভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। এখানে মেদিনীপুরের জনসভায় তাঁর ভাষণ প্রকাশ করা হল — সম্পাদক, গণদাবী]

পশ্চিমবাংলায় কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আপনারা যারা গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে নানা সংগ্রামী কর্মসূচি সফল করেছেন তাঁদের এবং এই জেলার জনগণকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি সিপিএমের সেইসব সৎ কর্মী-সমর্থকদের, যাঁরা তাঁদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলনকে সমর্থন করে যাচ্ছেন। আপনারা লক্ষ করছেন, নন্দীগ্রামে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে সিপিএম সরকার খানিকটা পিছু হঠেছে। প্রথম দিকে তারা ভেবেছিল যেহেতু তারা পশ্চিমবঙ্গের গদিতে, তাদের বিস্তর এমএলএ-এমপি, অসংখ্য পঞ্চায়েত আছে, পুলিশ-প্রশাসন তাদের হাতে, অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম তাদের জয়গান গাইছে, এবং দেশি একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি তাদের খুঁটি, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার তাদের বন্ধু, পুলিশের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত ক্রিমিনাল বাহিনীকে তারা কন্ট্রোল করছে; অতএব এই শক্তির জোরে তারা ইচ্ছামতো জমি দখল করে নিতে পারবে। কিন্তু নন্দীগ্রামে জনগণ প্রবল প্রতিরোধ করে জানিয়ে দিল যে, মানুষকে যতটা দুর্বল এবং যতটা মেরুদণ্ডহীন করতে পেরেছে বলে তারা ভেবেছিল, ততটা পারেনি। তার ফলে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হয়েছে যে, 'আমরা ভুল করেছি', যদিও এই কথাটাও একটা চালাকি মাত্র। জনগণের প্রবল বিরুদ্ধতা, নিচুতলার কর্মীদের আপত্তি, এরাজ্যে ও বাইরে সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে তারা। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের পক্ষে সমগ্র রাজ্যের জনগণ, শ্রমিক-চাষী-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুবক-মহিলা সকলেই দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছেন, যা এর আগে এতটা দেখা যায়নি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে চারটি বাংলা বন্‌ধ হয়ে গেল। ফলে সিপিএম চাইছে সময় নিয়ে একে খানিকটা স্তিমিত করে দিতে, জনগণের মধ্যে অনৈক্য এবং বিভ্রান্তি আনতে। তারপর তারা তাদের ষড়যন্ত্র হাসিল করবে।

সিপিএম নেতারা রাজ্যের জনগণকে প্রতিদিনই বলছেন, তাঁরা শিল্পায়ন চান, উন্নয়ন চান, তাঁরা বেকারদের কর্মসংস্থান চান। তাঁরা বলছেন, আমরা যাঁরা আন্দোলন করছি, আমরা হচ্ছি উন্নয়নবিরোধী, শিল্পায়নবিরোধী ; বেকারদের কর্মসংস্থান হোক আমরা চাই না। একথা কি ঠিক? যদি প্রকৃত শিল্পায়ন হত অবশ্যই আমরা সমর্থন করতাম। আমরা বারবার জনগণকে বলেছি, শিল্পায়নের নামে মানুষকে ধাপ্পা দেওয়া হচ্ছে। দু-চারটি কলকারখানা করা মানেই শিল্পায়ন নয়। শিল্পায়ন কথাটার একটা বিশেষ অর্থ আছে। শিল্পায়ন ঘটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে। আজকের যুগে এটা কি কোথাও ঘটছে? কোথাও কি এটা ঘটা সম্ভব? মাঝে মাঝে ২/৪টা কারখানা যা হচ্ছে, তাও হচ্ছে পুঁজি বা প্রযুক্তিনির্ভর, অর্থাৎ স্বল্প মজুর নিয়ে উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প। উৎপাদন বাড়লেও চাকরি হচ্ছে না, ওদের কথায় 'জবলেস্ গ্রোথ'।

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান শিক্ষক লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দেখালেন, এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। উন্নত দেশগুলিতে পুঁজিবাদ অবাধ প্রতিযোগিতার যুগ পার হয়ে একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে প্রবেশ করেছে। এখন এইসব দেশের বাজারের উপর সম্পূর্ণ কব্‌জা কায়েম করেছে সেখানকার মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী। দেশের মানুষকে শোষণ করে করে এরা দেশের ভিতরের বাজারকে এমনভাবে সঙ্কুচিত করে ফেলেছে যে, স্বদেশে বিনিয়োগ করলে তাদের মুনাফার স্বার্থ পূরণ হবে না। এই স্তরে ব্যাঙ্কিং পুঁজি ও শিল্প পুঁজির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে লগ্নি পুঁজির জন্ম দেওয়া হয়েছে, যা এখন বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। এ যুগে পুঁজিবাদ আর কৃষির বিকাশ ঘটাতে পারে না, শিল্পায়ন করতে পারে না, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে না। কারণ এ যুগের পুঁজিবাদ হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু, অবক্ষয়ী পুঁজিবাদ। এ যুগে বরং অবাধ শিল্পায়নের পথে সে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যুগে সর্বহারা বিপ্লবের দ্বারা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে না ভাঙতে পারলে শিল্পায়ন আর সম্ভব নয়। সিপিএম নিজেদের মার্কসবাদী বলে, অথচ সাম্রাজ্যবাদের যুগে দাঁড়িয়ে তারা বলছে, শিল্পায়ন করবে। কার ব্যাখ্যা মার্কসবাদ সম্মত — লেনিনের, না সিপিএমের?

বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যাকে বলা হয় বিশ্বের অর্থনীতির লোকোমোটিভ, ইঞ্জিন। সেই আমেরিকার বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা পর্যন্ত বলছেন, মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দা স্থায়ী রূপ নিয়েছে। শুধু আমেরিকা নয়, ইউরোপের অর্থনীতিতে, বা প্রায় সকল পুঁজিবাদী দেশেই এখন মন্দা চলছে। মাঝেমধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিনিয়োগের যে বিপুল বৃদ্ধি দেখা যায় সেটা আসলে বুদবুদ, অর্থাৎ বাজারে প্রকৃত চাহিদার সাথে এর সম্পর্ক নেই। জুয়া বা ফাটকার মতো লাভের আশায় এখানে বিনিয়োগ হচ্ছে, শেয়ারের দাম বাড়ছে, তারপর একটা সময় ফুলে-ওঠা বাজার ফেটে যাচ্ছে, যেমন বুদবুদ খানিকটা ফুলে উঠে ফেটে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশাল অঞ্চল জুড়ে কলকারখানা আজ বন্ধ। প্রতি মাসে সেখানে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। তিন কোটির মত মানুষ ফুটপাতে থাকে। একই সঙ্কট ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সে, জার্মানিতে, জাপানে, সমস্ত জায়গায়। সেইসব দেশে এখন শিল্পায়নের কথা বললে লোক হাসবে।

আমাদের দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এই রাজ্যে ৫৬ হাজারের ওপর কলকারখানা বন্ধ, ১৭ লক্ষের ওপর শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই হয়ে গেছে। প্রায় ১ কোটি নথিভুক্ত বেকার চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা নতুন শব্দ এসেছে সিক ইন্ডাস্ট্রি, মানে শিল্পেরও কঠিন রোগ হচ্ছে, কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে বাস্তব চিত্র। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ কলকারখানা বন্ধ। প্রায় পৌনে পাঁচ কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেছে। এই সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। এটা কি অগ্রগতির লক্ষণ ? এটা কি শিল্পায়নের চিত্র ? ন্যাশনাল লেবার সার্ভে'র ২০০৩ সালের রিপোর্ট বলছে, ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে কাজ পেয়েছে ১৬,০২৯ জন, আর কাজ হারিয়েছে ৩,৮৯,০৮৬ জন। ২০০৩ সালে কাজ পেয়েছে ৯,১২০ জন, আর কাজ হারিয়েছে ৬,৪৫,০০০ জন। এই হচ্ছে খোদ সরকারি রিপোর্ট। এই সংখ্যা আরও বাড়ছে। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের সরকারি দল সিপিএমের নেতারা আমাদের বোকা মনে করে ভেবেছিলেন, 'শিল্পায়ন' 'শিল্পায়ন' বললেই আমরা বুঝি হাততালি দেব। এটা আমরা পারিনি।

তমলুকের সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

আজকে বিশ্বের প্রায় সব দেশে এবং আমাদের দেশেও পুঁজিবাদী অর্থনীতি, অর্থাৎ বাজার অর্থনীতি কায়েম রয়েছে। পুঁজিবাদ সমাজের কথা ভাবে না, মানুষের কথা ভাবে না। তার একমাত্র স্বার্থ মুনাফা। বহুদিন আগেই মহান কার্ল মার্কস দেখিয়ে গেছেন, কোথাও কোন মালিক লাভ করতে পারে না শ্রমিককে শোষণ না করে, জনগণকে শোষণ না করে। পুঁজিপতিদের ক্রমাগত মুনাফার বৃদ্ধি চাই, নিজেদের মধ্যে কম্পিটিশানে টিকতে হলে সর্বোচ্চ মুনাফা চাই। সেজন্য তাদের দরকার পণ্য বিক্রির বাজার। ওরা যে দামে পণ্য বিক্রি করবে, সেই দামে কেনার মত খদ্দেরই হচ্ছে ওদের বাজার। জনগণের প্রয়োজনে বাজার নয়। এই বাজার না পেলে, বাজার ক্রমাগত না বাড়লে পুঁজি অলস হয়ে পড়ে। অথচ, পুঁজিবাদ নিজেই শ্রমজীবী জনগণকে ক্রমাগত শোষণ করে করে তাদের ক্রয়ক্ষমতাকে নিঃশেষ করে দিয়ে বাজার সঙ্কুচিত করে। যন্ত্র চালাতে যেমন কয়লা পুড়িয়ে ছাই করা হয়, পুঁজিবাদের মুনাফার মেশিন তেমনভাবে শ্রমজীবী মানুষের রক্ত-মাংস-হাড় সব গুঁড়িয়ে দেয়। এর ফলে বাজারের সঙ্কোচন হয় — বাজার সঙ্কট, অর্থাৎ চাহিদার সঙ্কট তৈরি হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এ হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য। শিল্পায়ন মানে হচ্ছে — ক্রমাগত বাজার বাড়ছে, চাহিদা বাড়ছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লাগাতার শিল্প হচ্ছে। এটা আজকের দিনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অবাস্তব।

বাজার সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে, বাজারের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে ইতিপূর্বে দু'দুটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। গ্রাম-শহর-সমাজ-সংস্কৃতি ধ্বংস হয়েছে। এখনও ইরাকে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলছে। সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে পরিচালিত পুঁজিবাদের কাছে মানুষের জীবনের মূল্য, সমাজ-সভ্যতার মূল্য কানাকড়িও নেই। এই দেখুন, বেশ কিছুদিন ধরে বৈজ্ঞানিকরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়ে যাচ্ছেন। বারবার তারা বলছেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড সহ অন্যান্য গ্রীনহাউস গ্যাস সৃষ্টি করে পুঁজিপতিরা মানবজাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা কর্ণপাত করছে না। অতি সম্প্রতি বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের সম্মেলন আবারও গভীর উদ্বেগে বলে গেল, এই গ্রীনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় হবে। বলছে, ইতিমধ্যেই মেরু অঞ্চলের হিমবাহ বা গ্লেসিয়ার গলে গিয়ে সমুদ্রের জলের উচ্চতা বাড়ছে। ফলে সুন্দরবন সহ বিশ্বের বেশ কিছু এলাকা ডুবে যাবে; বিশ্বে বন্যা, খরা, সাইক্লোন, সুনামি, ভূমিকম্প, মরুভূমি, মারণ ব্যাধি ভয়ঙ্কর বিপদ সৃষ্টি করবে। তা সত্ত্বেও এজন্য সবচেয়ে বেশি যে দায়ী সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বলছে, তারা গ্রীনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করবে না, কারণ তাতে তাদের শিল্পের সঙ্কট, অর্থাৎ মুনাফার সঙ্কট হবে। এই হচ্ছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের মানবসভ্যতা ধ্বংসকারী ভয়ঙ্কর রূপ।

ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে বহুকাল আগেই আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা, এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজি ও লগ্নিপুঁজির জন্ম দিয়ে ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌঁছেছে। সিপিএম, সিপিআই তাদের জনগণতান্ত্রিক বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন অনুযায়ী যখন জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীকে তাদের 'বিপ্লবের মিত্র' হিসাবে গণ্য করছে, জাতীয় বুর্জোয়াদের 'প্রগতিশীল' বলছে, তখন কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, ভারতীয় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্য অর্জন করার মধ্য দিয়ে চরম প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদে পরিণত হয়েছে। আমরা জানি, ভারতের একচেটে পুঁজিপতিরা অনেকদিন ধরেই অনুন্নত দেশগুলিতে লগ্নিপুঁজি বিনিয়োগ করছিল। আর এখন শিল্পোন্নত দেশগুলিতে গিয়ে তারা কারখানা কিনছে, বিশেষ বিশেষ পণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে ভারতীয় পুঁজির আধিপত্য কায়েম করতে চাইছে, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি হওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বিশ্বের বাজারে জায়গা করার জন্যই ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের শরিক হয়েছে। 'খুবই গরিব' যে টাটা কোম্পানিকে সিপিএম সরকারি কোষাগার থেকে জনগণের ১৪০ কোটি টাকা ভরতুকি দিয়ে সিঙ্গুরে জমি দিচ্ছে, সেই টাটাই ডাচ ইস্পাত কোম্পানি 'কোরাস' কিনে নিল ৫৫ হাজার কোটি টাকা দিয়ে। বিড়লা আমেরিকাতে কিনছে 'নভেলিস্' নামের একটা অ্যালুমিনিয়াম কারখানা, দাম দিচ্ছে ২৬ হাজার কোটি টাকা। টাটা-বিড়লা আম্বানি ছাড়াও অন্যান্য একচেটিয়া পুঁজিপতিরাও এখন বিদেশে নানা কারখানা কিনছে। এরা এই বিশাল পরিমাণ পুঁজির মালিক হয়েছে আমাদের দেশের জনগণকে শোষণ করে, পথের ভিখারি বানিয়েই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে চাই, '৬০ এর দশকে যাঁরা সিপিএমে যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের নিশ্চয় স্মরণে আছে, সেসময় সিপিএম নেতৃত্ব জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের যে তত্ত্ব নিয়ে বাজার গরম

চারের পাতায় দেখুন

মূল আক্রমণটা হানছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ

তিনের পাতার পর

করেছিলেন, সেই তত্ত্ব অনুযায়ী তাঁদের বিপ্লবের সামনে মূল শত্রু হচ্ছে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ, দেশিয় একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ততন্ত্র; আর তাঁদের মিত্র বা বিপ্লবী শক্তি হচ্ছে, শ্রমিক-কৃষক ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী। এখন দেখা যাচ্ছে, এই বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ ও দেশিয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থেই সিপিএম কৃষক, শ্রমিক ও জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে। অর্থাৎ বাস্তবে তাদের মিত্র দাঁড়িয়েছে, সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজি, আর শত্রু হচ্ছে কৃষক-শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ। কমরেড শিবদাস ঘোষ সেদিন দেখিয়েছিলেন, ভারতবর্ষে জাতীয় পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী, খেতমজুর, গরিব কৃষক ও মধ্যবিত্তকে নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে। সিপিএম নেতৃত্বের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগানের আসল চরিত্র উন্মোচন করে তিনি এও দেখান যে, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের পরিণামে সিপিএম আসলে বিপ্লবের বুলি আওড়াতে আওড়াতেই ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে বোঝাপড়া করে গদিসর্বস্ব রাজনীতির দিকে যাচ্ছে। আজ সেটাই বাস্তবে নগ্নভাবে দেখা যাচ্ছে।

ওরা বলছে, উন্নয়ন করছে। কী সেই উন্নয়ন? আমাদের দেশ শ্রেণীবিভক্ত। একদিকে শ্রমিক-খেতমজুর-গরিব চাষী-মধ্যবিত্ত জনগণ; আরেকদিকে আছে পুঁজিপতিশ্রেণী ও ধনীসম্প্রদায়। তারা কার উন্নয়নের কথা বলছে? যদি তারা বলে পুঁজিপতিদের উন্নয়ন, তাহলে তাদের কথা ঠিক। খবরের কাগজ খুলুন। কোন্ কোম্পানি কত শতাংশ মুনাফা বাড়িয়েছে, প্রতিদিনই এ খবর পাবেন আপনারা। এদের উন্নয়ন হচ্ছে। আর অন্যদিকে তাকিয়ে দেখুন, জনগণের অবস্থা কী? আমাদের কথা নয়, জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য বলছি। ২০০৪-০৫ সালের সময়কালে দেশে মানুষের ব্যয়ের মাত্রা ও ধরনের উপর সমীক্ষা করে তারা দেখিয়েছে যে, ভারতের গ্রামীণ জনগণের ৩৩ শতাংশের জীবনধারণের জন্য দৈনিক ১২ টাকার বেশি খরচ করার সামর্থ্য নেই। শহরের ক্ষেত্রে এটা দৈনিক ১৯ টাকা। এ টাকায় একটা সংসার চলে? চলতে পারে? অন্যদিকে জিনিষপত্রের দাম তো এবেলা-ওবেলা বাড়ছে। কীভাবে সংসার চলবে? এমনকী যাদের রোজগার দৈনিক ৪০/৫০ টাকা, তাদেরও কি সংসার চলে !

গোটা দেশের চিত্র কী? দেশে আজ কোটি কোটি বেকার ও কর্মচ্যুত শ্রমিক-কর্মচারী বেড়েই চলেছে। লক্ষ লক্ষ কৃষক ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করছে। উত্তর ভারতে প্রবল শীতে কত গরিব মানুষ মারা যাচ্ছে, এক খণ্ড শীতবস্ত্র কিনতে পারেনি। এই হচ্ছে দেশের চেহারা। গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন শহরে ছুটছে, অন্য রাজ্যে ছুটছে। গ্রামে কোনও কাজ নেই। কোথায় যাচ্ছে জানে না, শুধু এইটুকু জানে, গ্রামে থাকার উপায় নেই। অনেকে সপরিবারে চলে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ লোক স্টেশনে, প্ল্যাটফর্মে, ফুটপাতে থাকে, ঝুপড়ি করে থাকে। লক্ষ লক্ষ ঘরের মেয়ে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এই পশ্চিমবাংলা থেকে সবচেয়ে বেশি মেয়ে বিক্রি হচ্ছে। আট-ন' বছরের মেয়েরা পর্যন্ত পাচার হয়ে যাচ্ছে, কিনছে পশুরা। ভারতবর্ষে নারীপাচারে পশ্চিমবঙ্গ এখন শীর্ষস্থানে। সিপিএম সরকার এ ব্যাপারে কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। সিপিএম বলছে, কংগ্রেস বলছে, বিজেপি যখন সরকারে ছিল সেও বলেছে, উন্নয়ন হচ্ছে। এই তো উন্নয়নের চেহারা! উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় শিশুদের কঙ্কাল বেরোল, তাদের মায়েরা ওখানে গিয়েছিল বাড়ি বাড়ি কাজ করতে। এই পশ্চিমবাংলার মায়েরাও ছিল। তাদের শিশুদের কঙ্কাল পাওয়া গেল। এ তো ভয়ঙ্কর চিত্র! এর নাম উন্নয়ন? এই উন্নয়নকে আমরা সমর্থন করতে পারি না বলে আমাদের প্রতি শাসক দলগুলো ক্ষিপ্ত!

আসলে ওরা শিল্পায়নের নামে যে লক্ষ লক্ষ একর জমি নিচ্ছে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলত উপনগরী তৈরি করা। নতুন নতুন শহর করবে, প্রোমোটারি ব্যবসা করবে, লোকদেখানো ২/৪টা শিল্পও করবে। আমেরিকা প্রথম এ রাস্তা দেখিয়েছে। আমেরিকায় যখন শিল্পে সঙ্কট, পুঁজিপতিরা যখন কারখানায় পুঁজি নিয়োগ করতে পারছে না, বাড়তি পুঁজি অলস হয়ে যাচ্ছে, তখন সেখানকার শিল্পপতিরা আবাসন ব্যবসায় (রিয়েল এস্টেট) নামল — বাড়ি তৈরি কর, বিক্রি কর। ক্রেতাদের টাকা জোগাল ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের হাতেও এখন প্রচুর টাকা, কারণ শিল্পে বিনিয়োগ হচ্ছে না। দেদার বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। কারণ, আমেরিকাতেও সাধারণ মানুষের বাসস্থানের সমস্যা প্রবল। কিন্তু ধারের টাকা ব্যাঙ্ক ফেরত চাইতেই সমস্যা দেখা দিল। বাড়ির মালিকদের অত টাকা নেই, আবার ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা বাড়ি বিক্রি করাও সমস্যা, খদ্দেরও নেই। এই ঘটনার ফলে আমেরিকার জিডিপি, অর্থাৎ ডলার মূল্যে বার্ষিক মোট উৎপাদন পড়ে গেল। গত বছর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকার জিডিপি বেড়েছিল ৬.৫ শতাংশ, আর আট মাস পর নভেম্বর-ডিসেম্বরে জিডিপি নেমে এল ১.৫ শতাংশে। আবাসন ব্যবসার বুদবুদ ফেটে গেছে।

২৭ জানুয়ারি পুরুলিয়া শহরে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

সেই প্রমোটারি, হাউজিং বিজনেস বা রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করার জন্যই শিল্পপতিদের এ রাজ্যে জমি চাই। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া বা পশ্চিম মেদিনীপুরে নয়, উপনগরী করতে হলে, বাড়ির ব্যবসা করতে হলে কলকাতার আশেপাশে জমি দরকার। কলকাতার আশেপাশে উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি এগুলি উর্বর কৃষি এলাকা। এই কৃষিজমিতে ওরা হাত দিচ্ছে। এখানে ওরা হংকং-সিঙ্গাপুরের মতো শহর বানাতে চাইছে, যেখানে বিরাট বিরাট ফ্লাইওভার, রাস্তা হবে, অতি অল্পসময়ে ধনীরা বিমানবন্দরে যেতে পারবে। রায়চক থেকে একেবারে তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত আট লেনের রাস্তা হবে। বিদেশি সব ব্যবসায়ীরা, তাদের আমলারা, ম্যানেজাররা এখান দিয়ে যাতায়াত করবে। তাদের জন্য এসব রাস্তা দরকার। তারা মাঝে মাঝে এখানে থাকবে। এই সমস্ত ব্যবসায়ীরা, বড়লোকরা, এরকম প্রত্যেক শহরে একাধিক বাড়ি রাখে। এখানে দু'দিন, ওখানে পাঁচদিন থাকে। এই উপনগরীতে থাকবে দামী দামী হোটেল, মনোরম পার্ক, শপিং মল, রিসর্ট, নাইট ক্লাব, সুইমিং পুল, গল্ফ খেলার মাঠ, দামী মদের বার, নিয়মিত নারী সাপ্লাই, ভোগবিলাসের আরও নানা ব্যবস্থা। এই হচ্ছে তাদের পরিকল্পনা।

এস ই জেড বলে যেটা নন্দীগ্রামে করতে যাচ্ছিল, সেটাও একটা ভয়ঙ্কর স্কীম। বিশাল এলাকার কৃষকদের জমি-ঘর কেড়ে নেওয়া হবে, কৃষিজমি-স্কুল ধ্বংস করা হবে। হাজার হাজার কৃষক পরিবার পথের ভিখারি হয়ে যাবে। আবার এই এস ই জেডে যারা ব্যবসা করতে আসবে, তাদের কোন ট্যাক্স দিতে হবে না, এরা হবে সবরকম ট্যাক্সমুক্ত। রাজ্য সরকার এদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেবে, জল দেবে। আম্বানি, টাটা, সালেম যারা মিনিটে মিনিটে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করে, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা। একদিকে ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা নিয়ে বাজেট ঘাটতির কথা বলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ সব কল্যাণমূলক খাতে বাজেট কমাচ্ছে, অন্যদিকে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের দু-হাতে ট্যাক্স ছাড় দিচ্ছে, যার ফলে আরও ঘাটতি বাড়ছে।

অন্যদিকে এস ই জেডের মধ্যে যারা কারখানা বা ব্যবসাকেন্দ্র করবে, তারা শ্রমিক-কর্মচারীদের ইচ্ছামতো মজুরি দিতে পারবে, যত ঘণ্টা খুশি কাজ করাতে পারবে, যখন তখন ছাঁটাই করতে পারবে। শ্রমিকরা তাদের সমস্যা নিয়ে কোথাও অভিযোগ জানাতে পারবে না, দেশের শ্রমআইন এখানে প্রয়োগ হবে না। এই হচ্ছে আইনি বন্দোবস্ত। যেজন্য আমরা বলছি, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে বিশেষ কসাইখানা, যেখানে দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের জবাই করা হবে। দেশের আইন এখানে প্রযোজ্য হবে না। যে কারণে বলা হচ্ছে, দেশের মধ্যে আরেকটা দেশ।

সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি সকলেই এস ই জেড স্কীম চালু করতে তৎপর। যে রাজ্যে যে দল সরকার চালাচ্ছে, সেখানেই এরা কৃষিজমি-বাস্তুজমি দখল করে পুঁজিপতিদের হাতে, সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এদের সরকারগুলো হচ্ছে একচেটে পুঁজিপতিদের 'পলিটিক্যাল ম্যানেজার'। কারখানা চালানোর জন্য যেমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজার লাগে, ব্যবসা চালানোর জন্য বিজনেস ম্যানেজার লাগে, তেমনই তাদের হয়ে সরকার চালানো, তাদের স্বার্থেই আইন কানুন করা, এসবের জন্য পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে তারা নিয়োগ করেছে এই দলগুলোকে। কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম সকলে একই পথের পথিক। ফলে সরকারের মাধ্যমে আক্রমণটা এলেও মূল আক্রমণটা চালাচ্ছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ। তাই এখানে লড়াইও হবে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

সিপিএম কাজ করছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের হয়ে। কেন করছে? ১৯৭৭ সাল থেকে সিপিএম বারবার রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে। তারা চায় আরও বারবার আসতে। তারা চায় কেন্দ্রীয় সরকারে তাদের ক্ষমতা আরও বাড়াতে। তার জন্য প্রয়োজন — টাটা, বিড়লা, জিন্দাল, আম্বানিদের আশীর্বাদ, বিদেশি পুঁজির ব্যাকিং। কেননা, এরাই ঠিক করে কে গদিতে বসবে। ইলেকশনে এরাই কোটি কোটি টাকা ঢালে। সংবাদপত্রগুলি কে কন্ট্রোল করে? মালিকরাই করে। টিভি চ্যানেলগুলো মালিকরাই কন্ট্রোল করে। ইলেকশানে সংবাদপত্র-টিভি এইসব দলগুলির পক্ষে কাজ করে। বহুদিন আগে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন — এখন রাজা নেই, আছে রাজশক্তি, তাও জনাকয়েক ব্যবসাদারের হাতে। বণিকবৃত্তিই এখন মুখ্যত রাজনীতি। পুঁজিপতিদের শোষণের জন্যই শাসন। শরৎচন্দ্র মার্কসবাদী ছিলেন না। কিন্তু সত্যটা উপলব্ধি করেছিলেন। এখানে গণতন্ত্র, সর্বজনীন ভোট, গভর্নমেন্ট বাই দি পিপ্‌ল, অফ দি পিপ্‌ল, ফর দি পিপ্‌ল — এই সব কথাগুলো শুধু বইয়ের পাতায় আছে। বাস্তবে এখানে হল বাই, ফর ও অফ দি ক্যাপিট্যালিস্ট। তারাই সব কিছু ঠিক করছে। এ সত্য যতদিন আমরা না বুঝব, বারবার আমরা ঠকব।

একটা রাজনৈতিক দল, একটা নেতৃত্ব, কোন্ শ্রেণীর হয়ে কাজ করছে তা বুঝতে হবে। একথা বারবার আমাদের মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ তুলে ধরেছিলেন। এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই। সিপিএম যেহেতু মার্কসবাদের আলখাল্লা পরে বেড়ায়, দলের নামের পাশে 'মার্কসবাদী' লেখা থাকে, এটা দেখে আপনারা যদি ভুল বুঝে মার্কসবাদের বিরুদ্ধতা করেন, তবে সর্বনাশ হবে। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কথা। এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লববাদের যে ধারা ক্ষুদিরামকে দিয়ে শুরু হয়েছিল, তারই সার্থক প্রতিনিধি ছিলেন নেতাজী। সশস্ত্র মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদের ঝাণ্ডা তুলে ধরেন তিনি। এই নেতাজীর বিরুদ্ধে সেসময় টাটা-বিড়লার প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড়িয়েছিল কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব। এই সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে ত্রিপুরী কংগ্রেসে ষড়যন্ত্র করে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। পরে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়, শেষপর্যন্ত তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃত হয়ে তিনি রামগড়ে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের বামপন্থীদের একটা ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই প্রত্যেকটি পর্যায়ে তিনি খুব আশা নিয়ে সিপিআই-এর সহযোগিতা চেয়েছিলেন। কিন্তু বারবারই সিপিআই তাকে বিমুখ করেছিল। অথচ বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিন ১৯২৫ সালে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কর্তব্য হবে, আপসকামী বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিকল্প হিসাবে পেটি-বুর্জোয়া, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বিপ্লবীদের সাথে সহযোগিতা করা। কিন্তু সিপিআই তা করেনি। সিপিআই-এর এইসব ভূমিকা দেখে নেতাজী সুভাষচন্দ্র দুঃখ করে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্রকে বলেছিলেন, ভারতবর্ষে যারা কমিউনিস্ট বলে পরিচিত, তাদের দেখে মনে হয় না তারা দেশপ্রেমিক। তারপরে বললেন, আমি মার্কস-লেনিনের বই পড়েছি, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ডকুমেন্ট পড়েছি। তাতে বুঝেছি, যারা যথার্থ কমিউনিস্ট তারা খাঁটি দেশপ্রেমিক। এই ঘটনাটা এজন্য বললাম যে, সিপিআই-এর এইসব বিশ্বাসঘাতকতা দেখেও নেতাজী কিন্তু কমিউনিজম, মার্কসবাদ এবং সোভিয়েট নেতৃত্বকে ভুল বোঝেননি। তিনি বলেছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান মার্কসবাদ। বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান সোভিয়েট রাষ্ট্র, সর্বহারা সংস্কৃতি। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, কমিউনিজমের মতো সর্বজনীন আদর্শ ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করতে পারল না এইজন্য যে, এদেশে কমিউনিস্ট বলে যারা পরিচিত, তাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, কার্যকলাপ মানুষকে কাছে টানার পরিবর্তে দূরে ঠেলে দেয়। নেতাজী মার্ক্সবাদী না হয়েও মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী

পাঁচের পাতায় দেখুন

সিপিআই-এর বিশ্বাসঘাতকতা দেখেও নেতাজী সাম্যবাদী আদর্শ ও মার্কসবাদের বিরুদ্ধতা করেননি

চারের পাতার পর

হিসাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে মার্ক্সবাদ ও কমিউনিজমের অপরিহার্য গুরুত্ব বুঝেছিলেন।

এই সুভাষচন্দ্রই সিঙ্গাপুর থেকে শেষ রেডিও ভাষণে বলেছিলেন, এখনও স্ট্যালিন বেঁচে আছেন, আগামী কয়েক যুগ বিশ্ব তাঁর উপরই নির্ভর করবে। এও আপনারা জানেন, শেষের দিকে তিনি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় যাওয়ারই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। ইতিহাসের এই অধ্যায়টা আমি বলছি এইজন্যই যে, নেতাজীর মতো মানুষ, যাঁকে সিপিআই ফ্যাসিস্ট জাপানের দালাল পর্যন্ত বলেছিল, তিনি কিন্তু সিপিআইকে দেখে সাম্যবাদের আদর্শকে, মার্ক্সবাদকে ভুল বোঝেন নি, তার বিরুদ্ধতা করেন নি। আপনারা জানেন, এই সিপিআই '৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবের বিরুদ্ধতা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করেছিল। যার জন্য ১৯৫১ সালে মস্কোয় স্ট্যালিনের সাথে সিপিআই নেতারা দেখা করতে গেলে তিনি তাঁদের তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন বলে সেই যুগের সিপিআই নেতা ডঃ রণেন সেন লিখেছেন। এরা মুসলিম লিগের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে দেশ বিভাগকেও সমর্থন করেছিল। এই হচ্ছে এদেশে অবিভক্ত সিপিআই নেতাদের ইতিহাস। সিপিআই-এর এসব ভূমিকা দেখে ও এই ধরনের ভুলের কারণ কি, তা মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে হাতিয়ার করে বিচার করে, কমরেড শিবদাস ঘোষ এই স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, এই দলটি আদৌ মার্ক্সবাদী নয়। এদের জীবনদর্শন, বিচারধারা, দলের গঠনপদ্ধতি, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, তাদের সংস্কৃতি, আন্দোলন পদ্ধতি — কোনটাই মার্ক্সবাদসম্মত নয়। এজন্যই তিনি '৪০-এর দশকে এস ইউ সি আইকে গড়ে তোলার সঙ্কল্প নেন।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আমাদের পার্টি যখন এই ব্যাখ্যা রাখত, অনেকেই বুঝতে চাইত না। ওদের দেখিয়ে বলত, ওরাই খাঁটি কমিউনিস্ট পার্টি, ওরাই বিপ্লব করবে। ওরা তখন গণআন্দোলনে ছিল, জনগণ তাদের আন্দোলনে দেখেছে। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়ে বারবার বলেছেন, এদের মুখে বিপ্লবী বুলি, লড়াই-লড়াই জঙ্গিভাব এসবের আসল লক্ষ্য হচ্ছে ভোট — কংগ্রেস শাসনের ফলে মানুষের সমস্যা-সঙ্কট বাড়ছে, ক্ষোভ বাড়ছে, তাকে পুঁজি করে বিক্ষোভমূলক আন্দোলন গড়ে তোলা, তারপর ভোটে তা কাজে লাগানো। সিপিআই ও পরে সিপিএম নেতৃত্ব সম্পর্কে এই বিশ্লেষণ তিনি দীর্ঘদিন ধরে বলেছেন। আজ বাস্তবের দিকে তাকিয়ে দেখুন। পরিস্থিতি কোথায় দাঁড়িয়েছে? ওদের দলের কর্মীরা অনেকে সৎ, সংগ্রামী। তারা প্রাণ ঢেলে ঐক্যবদ্ধ সিপিআই এবং পরে সিপিএমকে গড়ে তুলেছিল। তারা যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চায়নি, অন্ধের মত নেতৃত্বকে সমর্থন করেছে। আজ তার পরিণতি কী? মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, টাটার কেশাগ্র স্পর্শ করতে দেব না। এতটুকু লজ্জা হল না। অথচ টাটাকে কেউ ধরতেও যায়নি, ধরার প্রস্তাবও দেয়নি। টাটার জন্য কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন হচ্ছে। আগেকার দিনে জমিদারের 'বডিগার্ডরা' যেমন বলত, আমি বেঁচে থাকতে প্রভুর গায়ে হাত পড়বে না, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কথাও অনেকটা সেরকম। এই টাটার স্বার্থ রক্ষার্থে তিনি কৃষকদের রক্ত ঝরালেন।

মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক সভায় বলছেন, মালিক-শ্রমিক বন্ধুত্ব চাই। এরকম মার্ক্সবাদ কেউ শোনেনি। মার্ক্সবাদের গোড়ার কথা হচ্ছে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম। পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী ক্রমাগত সংগ্রাম তীব্র করবে, তার মধ্যে দিয়ে বিপ্লবের দিকে যাবে। আর এখানে সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিকদের বলছেন, মালিক-শ্রমিক বন্ধুত্ব কর, লড়াই করোনা, ধর্মঘট করো না, শিল্পে অশান্তি করো না। যা টাটা-বিড়লার কথা, সাম্রাজ্যবাদীদের কথা, তাই আজ সিপিএম নেতাদের কথা। দলের মূল চরিত্র, দলের মূল রাজনীতিই তাঁদের আজ এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। আগামী দিনে এটা আরও সাংঘাতিক রূপ নেবে।

ফলে বাস্তবে এখন ঝাণ্ডার পার্থক্য ছাড়া কংগ্রেস-তৃণমূল-বিজেপি-সিপিএমের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকছে না। সিপিএমের বহু কর্মী আফশোস করে আমাদের বলেন যে, 'সিপিএম দল শেষ হয়ে গেছে। আমাদের নেতারা সব শেষ করে দিয়েছে।' বলেন, 'আপনাদের দেখলে ভরসা পাই।' অনেক বৃদ্ধ প্রবীণ মানুষ একসময়ে যাঁরা ঘর-বাড়ি-কেরিয়ার ছেড়ে কাজ করেছেন ঐ পার্টির জন্য, এখন বলেন, 'আমাদের বয়স হয়েছে, আর সেই সুযোগ নেই। আপনারা এগিয়ে চলুন, আমরা আছি।' বহু জায়গায় সিপিএম-সিপিআই করা পুরানো লোকজন, বয়স্ক লোকজন অতীতের কথা ভাবেন, আর তাঁদের চোখে জল এসে যায়। দলের নেতারা এখন এঁদের কথার মূল্য দেয় না। সেজন্যই আমি বলছিলাম, সিপিএমকে দেখে মার্কসবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা করবেন না।

আমরা লড়ছি কীসের জোরে? আমাদের দলের কর্মীরা যথার্থ মার্কসবাদের ভিত্তিতে, কমরেড শিবদাস ঘোষ এদেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্ক্সবাদের প্রয়োগ ঘটিয়ে আদর্শের যে জীবন্ত রূপটি আমাদের দিয়েছেন, তাকে হাতিয়ার করে লড়ছে। আর সিপিএমের মুখে মার্ক্সবাদ হচ্ছে ভণ্ডামি। কথায় আছে, গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হয়না, খদ্দর পরলেই স্বদেশী হয়না। চরিত্র দেখতে হয়, বিচার করতে হয়, কথাগুলি ঠিক কি না। কথায় ও কাজে মিল আছে কিনা দেখতে হয়। নাহলে ভণ্ডলোকেরা ঠকাবে।

মার্ক্সবাদ হচ্ছে বিজ্ঞান। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, বোটানি ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষ বিশেষ নিয়মকে কো-অর্ডিনেট করে সাধারণ নিয়ম বা জেনারেল ল গড়ে তোলার বিজ্ঞানটাই হচ্ছে মার্ক্সবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। বিশ্বজগৎ, প্রকৃতি, সমাজ — সকল সমস্যায়, সকল প্রশ্নে সত্য নির্ধারণে মার্কসবাদই একমাত্র বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার। এই মার্ক্সবাদই দেখিয়েছে, কোন কিছুই চিরদিন থাকবে না। শোষণ চিরদিন ছিল না, চিরদিন থাকবে না। ইতিহাসের অনুদ্ঘটিত অধ্যায়কে উদ্ঘাটন করে, সেই আদিম সমাজ থেকে সমাজ পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি ও নিয়মকে বিচার-বিশ্লেষণ করে মার্কসবাদ দেখিয়েছে, প্রকৃতি জগতের পরিবর্তনের যেমন নিয়ম আছে, সমাজের পরিবর্তনেরও তেমনি নিয়ম আছে। এই নিয়মকে জেনে-বুঝে এবং তার ভিত্তিতে ক্রিয়া করে সমাজকে পরিবর্তন করা যায়। মার্ক্সবাদকে অমান্য করা মানে একথা মেনে নেওয়া যে, সমাজে শোষণ থাকবে, মুনাফা থাকবে, ধনী-গরিব থাকবে, দারিদ্র-বেকারত্ব থাকবে, নারীধর্ষণ থাকবে, পতিতাবৃত্তি থাকবে, নারীপাচার থাকবে, অনাহারে মৃত্যু থাকবে। মালিকরা মানুষকে বোঝাবে, এ সবই অদৃষ্ট, কপাল — পূর্বজন্মের পাপের ফল। বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে এসব মিথ্যার মুখোশ খুলে দিয়েছে মার্ক্সবাদ। সেইজন্যই পুঁজিপতিরা মার্ক্সবাদকে ভয়ের চোখে দেখে। তারা কৃষি, শিল্প, যানবাহন, চিকিৎসা, সৌরজগৎ সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান প্রয়োগ করছে। কিন্তু ইতিহাস ও সমাজ বিচারে, মানুষের ভালমন্দ বিচারে, সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও বিচারধারা প্রয়োগে তাদের ঘোরতর আপত্তি। এখানে 'বিধাতার ইচ্ছাই কর্ম', নাহলে পুঁজিপতিশ্রেণীর নিজেদের অস্তিত্বই যে বিপন্ন হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপর্যয়, চীনের বিপর্যয় দেখে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। সমাজতন্ত্রে এরকম বিপর্যয় ঘটা অসম্ভব নয়। মহান লেনিন নিজের হাতে বিপ্লব করেও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, ঠিক পথে না চললে সর্বনাশ হবে। স্ট্যালিন, মাও সে-তুং, শিবদাস ঘোষ একই কথা বলেছেন। দেশের বাইরের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শক্তি ও ভিতরের প্রতিবিপ্লবী শক্তি দালাল তৈরি করে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে। মনে রাখবেন, সমাজতন্ত্র আবার আসবে। কারণ, সমাজতন্ত্র ছাড়া মানুষের সামনে বাঁচার আর কোনও পথই খোলা নেই। খোদ আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্সে সঙ্কটজর্জরিত জনগণ মিছিলে স্লোগান তুলছে, সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক। আমেরিকাতে তিন কোটি লোক ফুটপাতে থাকে, লঙ্গরখানায় খায়। এরা বাঁচবে কী করে?

আজ যারা মদের বোতল হাতে নিয়ে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সেতুঙের বিরুদ্ধে কলম চালায়, তারা ইতিহাসের কিছুই জানে না। এদের কথা মানলে বলতে হয়, রমাঁ রলাঁ, বার্ণাড শ, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, সুভাষচন্দ্র সবাই বুদ্ধিহীন ছিলেন ! কারণ এঁরা সকলেই মার্কসবাদী না হয়েও সমাজতন্ত্রের জয়গান করে গেছেন। মনে রাখবেন, মার্ক্সবাদ ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধতা করে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে না, কোন প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলে না। আন্দোলনে নৈতিক বলও থাকে না। কমরেড শিবদাস ঘোষ একথা বারবার বলে গেছেন।

সিপিএম-এর অনেকেই যেমন আমাদের বলেছেন, আপনারা লড়ুন, আপনারা আছেন বলেই আমরা ভরসা পাই; তেমনি তৃণমূলেরও নীচুতলার অনেকেই বলেন, 'আমরা জানি, আমাদের নেতারা বেশীদূর যাবে না। তারা সব উল্টোপাল্টা করছে। আমরা এস ইউ সি আই-কে জানি। এই দল থাকলে লড়াই ঠিকমত চলবে।' কেউ কেউ বলেন, 'এস ইউ সি আই আর তৃণমূল ঐক্য করে আন্দোলন করুক।' আমরা বলি, তা সম্ভব নয়। এখানে যদি তৃণমূলের কেউ থাকেন তাঁদের আমি বলে যেতে চাই, আমাদের যদি মন্ত্রীত্বের লোভ থাকত, এমএলএ-এমপি বনবার মোহ থাকত, তাহলে হয়ত তাঁদের সঙ্গে যেতাম। গত ২০০১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে সিপিএম আমাদের আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে আমন্ত্রণ করেছিল, আমাদের সঙ্গে ভোটে ঐক্য চেয়েছিল। আমরা বলেছিলাম, আপনাদের আমরা কোনদিনই কমিউনিস্ট মনে করি না। কিন্তু অতীতে যতটুকু বামপন্থার চর্চা করতেন, এখন তাও প্রায় বিসর্জন দিয়েছেন। আপনাদের সরকারের সঙ্গে কংগ্রেস, বিজেপি সরকারের কোনও পার্থক্য থাকছে না। ফলে আপনাদের সঙ্গে আমাদের ঐক্য হতে পারে না। এই কথা যখন বলেছি আমরা জানতাম, জয়নগর-কুলতলিতেও ওরা আমাদের নানা উপায়ে ভোটে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তবু আমরা দৃঢ়তার সাথে ঐ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, এ দল গণআন্দোলনের, বিপ্লবী লড়াইয়ের। ইলেকশনে একটা সিট না পাও না পাবে, একটা ভোট না পাও না পাবে, তবু নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিও না, গরিব মানুষের সঙ্গে বেইমানি কোরনা। আমরা আজও কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে দৃঢ়তার সাথে সেই পথে চলছি।

এবারকার ভোটে তৃণমূলের হয়েও একদল 'ফিলার' নিয়ে এসেছিল আমাদের কাছে। আমরা সেটাও প্রত্যাখ্যান করেছি। সিপিএম-এর সাথে থাকলে বা তৃণমূলের সাথে থাকলে, আমাদের এম এল এ বাড়ত। সিপিএমের সাথে থাকলে তো মন্ত্রীত্বই পেতাম। আমরা তবু সেপথে যাইনি। এর কারণ কি? তৃণমূল একটা দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া পার্টি। এই সেদিন কেন্দ্রীয় সরকারে তারা বিজেপির সাথে ছিল এবং তৃণমূল যখন এনডিএ সরকারে ছিল, সেইসময়ই এস ই জেড সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবারও সিঙ্গুরে আন্দোলন হওয়ার আগে তৃণমূল নেত্রী কলকাতায় পুঁজিপতিদের মিটিংয়ে ডেকে বলেছিলেন, 'আমাদের ভুল বুঝবেন না। আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে নই।' আর আমাদের দল এস ইউ সি আই হচ্ছে পুঁজিবাদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দল। তৃণমূল কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দল নয়। কংগ্রেস-বিজেপির মতোই পুঁজিবাদের-সাম্রাজ্যবাদের ব্যাকিং-এ সরকারে আসতে চায়। তাই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সাথে সম্পর্ক রেখে, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের আশ্বস্ত করে ওরা আন্দোলনের কথা বলে। তৃণমূল মনে করে, শিল্পায়ন সম্ভব, তবে সিপিএম পারবে না, তৃণমূল সরকারে গেলে পারবে। আমরা বলছি, বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্পায়ন অসম্ভব। এই স্লোগানটাই ভাঁওতা। কেন তা ধাপ্পা তা বুঝতে হলে মার্ক্সবাদকে জানতে হবে, না হলে বোঝা যাবে না। শিল্পায়নের ধাপ্পা দিয়েই পুঁজিবাদ কাজ হাসিল করতে চাইছে। একই স্লোগান শুধু সিপিএম-ই নয়, তৃণমূল, বিজেপি ও কংগ্রেসের কণ্ঠেও। স্পেশাল ইকনমিক জোনের স্কীমকেও তৃণমূল সমর্থন করছে। আমরা চাই ভোটের দিকে তাকিয়ে আন্দোলন করা নয়, আন্দোলন হবে দাবি আদায়ের জন্য। দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবের পরিপূরক হতে হবে। কারণ যতদিন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ থাকবে ততদিন কৃষিজমির ওপর আক্রমণ আসবে; শ্রমিকের ওপর, মধ্যবিত্তের ওপর আক্রমণ আসবে। তাই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার জন্য মার্ক্সবাদকে হাতিয়ার করে সর্বহারা বিপ্লব চাই। এখানেই আমাদের সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের মৌলিক পার্থক্য। আন্দোলনের নামে তৃণমূল কংগ্রেস আজ যেটা করছে, পঞ্চাশের দশকে-ষাটের দশকে মার্ক্সবাদের কথা বলে সিপিআই-সিপিএম অনেকটা সেই চেষ্টা করেছিল। কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলনের স্লোগান তুলে মানুষের বিক্ষোভ জাগিয়ে, সে বিক্ষোভ থেকে ভোটের ফয়দা তোলাই ছিল তাদের লক্ষ্য। তৃণমূল নেতৃত্ব ঠিক তাই আজ করছে — যার জন্য অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, সিঙ্গুরেও জনগণ লড়তে চেয়েছিল, নন্দীগ্রামের মত রুখতে তারাও পারত, কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্বের ভূমিকার জন্য তা হতে পারল না। ওখানে এম এল এ তৃণমূলের, পঞ্চায়েত তৃণমূলের। আমাদের কিছু শক্তি আছে ঠিকই, কিন্তু সিঙ্গুরে তৃণমূলের শক্তিই প্রধান। তৃণমূল নেতৃত্ব সেখানে লড়াই করতে দিল না। এ নিয়ে আমাদের সঙ্গে প্রবল দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়েছে। আপনারা অনেকেই জানেন না, সিঙ্গুরে প্রথম আন্দোলন শুরু করি আমরা, তৃণমূল নয়। এস ইউ সি আই আন্দোলন করছে দেখে পরে তৃণমূল ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষদের নিয়ে একটা পাবলিক কমিটি হয় — ''কৃষিজমি বাঁচাও কমিটি''। এই কমিটিতে কনভেনার ঠিক হয় আমাদের একজন, তৃণমূলের একজন। সব জায়গায় আন্দোলনে আমরা যেমন করি, সিঙ্গুরেও তেমন আমরা পাড়ায় পাড়ায় গণকমিটি করেছি। যুবক, মহিলাদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী তৈরি করেছি প্রতিরোধ করার জন্য। আমরা চেয়েছিলাম, জমি অধিগ্রহণ করতে এলে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। প্রয়োজনে তাকে লাগাতার চালিয়ে যেতে, যেমন পরে নন্দীগ্রামে হয়েছে। কিন্তু তৃণমূল সেটা চায়নি। তারা শুধু চেয়েছিল, আন্দোলনের নামে এমন কিছু করতে যাতে তারা পাবলিসিটি পেতে পারে, তারা যে লড়ছে তা দেখানো যেতে পারে এবং এভাবে জনগণের ওপর তাদের প্রভাব বাড়াতে পারে। পুলিশ যখন জমি দখল করতে নামে তখন যে

ছয়ের পাতায় দেখুন

আন্দোলন হবে দাবি আদায়ের জন্য — ভোটে ফয়দা তোলার জন্য নয়

পাঁচের পাতার পর

দু'দিন প্রতিরোধ সংগ্রাম হয়েছিল, তাতেও জনগণের সঙ্গে আমাদের কর্মীদের ভূমিকাই প্রধান ছিল। তৃণমূল নেতারা শুধুমাত্র আইনঅমান্য করে, জেলে গিয়েই তাঁদের দায়িত্ব সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন। এমনকী দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, শহীদ রাজকুমার ভুল ও তাপসী মালিকের নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়েও সিঙ্গুরে এবং গোটা রাজ্যে কার্যকরী আন্দোলন করা গেল না মূলত ওদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য — যদিও আমরা সাধ্যমত করে গেছি। আমরা গোটা রাজ্যে শহীদ রাজকুমার ভুলের ও তাপসী মালিকের স্মরণে ৩ অক্টোবর ও ২৩ ডিসেম্বর শোকদিবস পালন করেছি। তৃণমূল নেতৃত্ব কোনও উদ্যোগ নেয়নি। ২ ডিসেম্বর পুলিশ সিঙ্গুরে নৃশংস অত্যাচার চালাল, বাড়ি বাড়ি ঢুকে মারল, আগুন জ্বালাল, তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলায় আমরা এককভাবে ৫ই ডিসেম্বর ২৪ ঘণ্টা বন্ধ ডেকেছিলাম। এইভাবে সিঙ্গুরের বুকে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া এবং তার সমর্থনে গোটা রাজ্যে বন্ধ ও সমস্ত জেলায় এসপি অফিস অবরোধের কর্মসূচি যখন আমরা পুলিশি আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে করছি, তখনই আচমকা তৃণমূল নেত্রী অনশন শুরু করলেন। যে লড়াই সিঙ্গুরের মাটিতে হওয়া দরকার ছিল, যে লড়াইকে গোটা রাজ্যে জেলায় জেলায় প্রসারিত করার দরকার ছিল, সেটাকে কলকাতায় এক ব্যক্তির অনশন মঞ্চে সীমাবদ্ধ করা হল। একথা ঠিক, অনশন করতে গিয়ে তিনি শারীরিক কষ্ট ভোগ করেছেন, অসুস্থ হয়েছেন, সংবাদমাধ্যমে তাঁর প্রচারও হয়েছে, কিন্তু ফল কী হল? গোটা রাজ্যের দৃষ্টি চলে গেল সিঙ্গুরে আন্দোলনের পরিবর্তে অনশন মঞ্চের দিকে — যেন অন্য কোন আন্দোলনের দরকার নেই, অনশনই সব ঠিক করে দেবে। কয়দিন অনশন চলবে, কীভাবে অনশনের সমাপ্তি ঘটবে, রাজ্যপাল থেকে শুরু করে কোন্ কোন্ নেতা-মন্ত্রী অনশন মঞ্চে এলেন, এ নিয়েই জল্পনা-কল্পনা চলল, আর আন্দোলন পিছনে চলে গেল। তারপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পরামর্শের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী সবকিছু নিয়ে আলোচনা করবেন, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় অনশন ভঙ্গ হল। সিঙ্গুরের জমি দখলও করবেন এবং সবকিছু নিয়ে আলোচনাও করবেন, এ'কথা তো মুখ্যমন্ত্রী আগেও বলেছিলেন। তৃণমূল নেত্রী নতুন কী পেলেন? আর এখন তৃণমূল নেত্রী বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ফাঁকা কথায় বিশ্বাস করতে তাঁকে কে বলেছিল? কিন্তু নন্দীগ্রাম এ ভুল করেনি। নন্দীগ্রাম আন্দোলনে তৃণমূল নেতৃত্বের প্রাধান্য ছিল না। আমাদের দলই প্রথমে আন্দোলনের উদ্যোগ নিয়েছিল এবং সিপিআই-সিপিএম-তৃণমূল ও কংগ্রেসের এবং কোন দল করে না এমন লোকজন — সকলকে নিয়েই পাবলিক কমিটি গড়ে তোলা হয়েছিল। এই কমিটির আহ্বানে নন্দীগ্রামের জনগণ সাড়া দিয়েছে। আমাদের কর্মীরা পাড়ায়-পাড়ায় গণকমিটি, ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলেছে। নন্দীগ্রামের যে এলাকায় প্রতিরোধ সংগ্রাম হয়েছে সেটা মূলত সিপিএমের ঘাঁটি ছিল। সেখানকার জনগণই বীরের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ সংগ্রাম করে সরকারকে সাময়িকভাবে হলেও পিছু হঠতে বাধ্য করেছে। মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হয়েছে, নোটিশ জারি করে ভুল করেছি। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ থেকেই নন্দীগ্রামের সংগ্রামী ঐতিহ্য আছে। এখানে তেভাগা আন্দোলন হয়েছে। ৮০'র দশকে এখানে নন্দীগ্রাম উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে। সিঙ্গুরের লড়াই নন্দীগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু নন্দীগ্রাম যা পারল, এখনও পর্যন্ত সিঙ্গুর তা পারেনি। নন্দীগ্রামের জনগণের সংগ্রামী দৃঢ়তা, তাদের প্রতি পশ্চিমবাংলার ও ভারতবর্ষের জনগণের প্রবল সমর্থনের ফলে সিপিএম এখনও পর্যন্ত পুলিশ ও সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনী নিয়ে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি, তারা সুযোগ খুঁজছে। তৃণমূল সিঙ্গুরে ব্যর্থ হয়ে নন্দীগ্রামে ভোটের জমি তৈরির জন্য সিপিএমের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাচ্ছে, যেটা সিপিএমকে সুযোগ করে দিচ্ছে আবার আক্রমণের। এর ফলে নন্দীগ্রামে অর্জিত জয় বিপন্ন হচ্ছে। আন্দোলনের চাপে তৃণমূল পাবলিক কমিটিতে এলেও এই কমিটির মতামতের তোয়াক্কা না করেই তারা নিজেদের দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থে যা মনে করছে তাই করছে।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। তাহল, কোন গণআন্দোলন ঠিকমত চালাতে হলে, জিততে হলে, সঠিক সংগ্রামী রাজনীতি তো চাই-ই, তার সাথে সঠিক কর্মসূচি ও রণকৌশলও চাই। যার বিরুদ্ধে লড়াই, তার রাজনীতি, কর্মধারা, প্রচার, আক্রমণ, কলাকৌশল এসব বুঝেই এটা ঠিক করতে হয়। তৃণমূল এসবের বিশেষ ধার ধারে না। ভোটের রাজনীতিই তাদের একমাত্র রাজনীতি।

আপনারা জানেন, বর্তমান আন্দোলনে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের কৃষক-খেতমজুরদের তথা এ'রাজ্যের এবং সমগ্র দেশের জনগণের দাবি হচ্ছে, কৃষিজমি ধ্বংস করা চলবে না, আবাসন ও কিছু শিল্প করতে হলে তা অকৃষি জমি ও বন্ধ কল-কারখানার জমিতেই করতে হবে। অথচ তৃণমূল নেতৃত্ব এই মূল জায়গা থেকে সরে এসে দাবি তুলছে, জমি দিতে যারা অনিচ্ছুক তাদের জমি ফেরৎ দিতে হবে। কারা ইচ্ছুক ও কারা নয়, এভাবে ভাগ করার দ্বারা বাস্তবে চাষীদের মধ্যে অনৈক্যই সৃষ্টি করা হচ্ছে, আন্দোলনই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সিপিএম কিন্তু সিঙ্গুরে এই দাবি না মানলেও অন্যত্র প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে এই 'ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক' দাবি লুফে নেবে। কারণ, সিপিএম জানে, লোভ দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে সরকারি দল হিসাবে তাদের পক্ষে এমন 'ইচ্ছুক'-এর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে নেওয়ার বিশেষ অসুবিধা হবে না।

৩ ফেব্রুয়ারি বেহালার রায়নগর মাঠের সভায় ব্যাপক জনসমাগমের একাংশ

কেন তৃণমূল মূল দাবি থেকে সরে এল? আসলে তৃণমূল নেতৃত্ব পুঁজিপতিদের আশ্বস্ত করতে চায়। নিজেদের 'দায়িত্বশীল বিরোধী' প্রমাণ করতে চায়। অথচ কৃষিজমি এভাবে ধ্বংসের পরিণাম দেশের পক্ষে ভয়াবহ। এর ফলে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন মার খাবে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো থেকে আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়বে — যেটা সাম্রাজ্যবাদীরা চাইছে এবং ইতিমধ্যে সে প্রক্রিয়া শুরুও হয়েছে।

এখানেই কমরেড শিবদাস ঘোষের সেই ঐতিহাসিক শিক্ষা উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেছেন, শুধু লড়লে, রক্ত ঢাললে, প্রাণ দিলেই হবে না। লড়াইয়ের নেতৃত্ব, রাজনীতি, লড়াইয়ের রাস্তা সঠিক হওয়া দরকার। ফলে, রাস্তা ঠিক হলে সিঙ্গুর আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে। সিঙ্গুরে এখনও প্রতিবাদের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। আবার ঠিকমতো সংগঠিত হলে ব্যাপকভাবে গণআন্দোলনের আগুন জ্বলে উঠতে পারে। তৃণমূলের নীচুতলার যাঁরা কর্মী তাঁরা সাধারণ ঘরেরই মানুষ। সিপিএমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরা তৃণমূল করছেন। তাঁদের বলছি, আমাদের কথাগুলো আপনারা ভেবে দেখুন।

তৃণমূল নেতৃত্ব কখনও কংগ্রেসের সাথে, কখনও বিজেপি'র সাথে চলছে। আসলে সবটাই ভোটের হিসাব। কংগ্রেস, বিজেপিও একই হিসাব করে আন্দোলনের মহড়া দিচ্ছে। আর, তাদের সরকারই অন্য রাজ্যে কৃষিজমি দখল ও সেজ চালু করছে। গোটা রাজ্যের জনগণ আজ সিপিএম বিরোধী। এই বিরোধিতাকে পুঁজি করে এইসব শক্তি আগামী পঞ্চায়েত, লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটে নিজেদের জমি তৈরি করছে, এরা পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিছু বলেনা। আমরা এই ভোটসর্বস্ব রাজনীতির মধ্যে নেই। আপনারা আমাদের জানেন। ১৯ বছর ধরে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ফিরিয়ে আনার জন্য লড়াই করেছি, বুদ্ধিজীবীরা এবং আপনারা সকলে সঙ্গে ছিলেন। আমরা দাবি আদায় করেছি। অন্য কোন রাজনৈতিক দল সেই লড়াইয়ে আসেনি। প্রতি বছর ব্যাপক সাধারণ মানুষ ও আমাদের দলের কর্মীদের অন্য কোন দল ভাবতে পারে না। এটাও একটা আন্দোলন। আমরা আন্দোলন করে কয়েকবার স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির বেতন কমিয়েছি, মেডিকেল কলেজে ছাত্র বেতন কমিয়েছি। আমরা আন্দোলন করে হাসপাতালের চার্জ কিছুটা কমিয়েছি। বিদ্যুৎ মাশুল, কৃষিবিদ্যুৎ মাশুল আন্দোলন করে খানিকটা হলেও কমানো হয়েছে। আমরা আন্দোলন করে সাহারা কোম্পানিকে সুন্দরবনের নদী ইজারা দেওয়া ঠেকিয়েছি। সরকার দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং পুরুলিয়ায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে গিয়েছিল, আমরা আন্দোলন করে ঠেকিয়েছি। চটকলে শ্রমিকদের বেতন কমানোর জন্য কালা চুক্তি করেছিল রাজ্য সরকার এবং কংগ্রেস-সিপিআই-সিপিএমের ইউনিয়ন। আমরা আন্দোলন করে আটকেছি। বিড়ি শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা মালিকরা মেরে দিচ্ছিল, আমরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। আর্সেনিকের আক্রমণে বহু মানুষ মারা গেছে। এ ব্যাপারে আমরা আন্দোলন করে কিছুটা দাবি আদায় করেছি। পুলিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জেলায় জেলায় পাচার হওয়া বহু নারী উদ্ধার করিয়েছি। এরকম ছোট বড় বহু আন্দোলনে আমরা দাবি আদায় করেছি। বারো-তেরো বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনশিক্ষা চালু করতে চাইছে সরকার, তার বিরুদ্ধেও আমরা লড়ছি। এইডস রোগ প্রতিরোধ করার নামে নোংরা বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে, আমরা তার বিরুদ্ধে লড়ছি। এরকম বহু লড়াই হচ্ছে। আর কোন্ দল এইসব দাবি নিয়ে লড়ছে? জনগণকে নিয়েই আমরা লড়ছি। আমাদের শক্তি জনগণ।

আমাদের খবর রেডিও, টিভি, খবরের কাগজে পাবেন না। এদের প্রচার ছাড়াই মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে এস ইউ সি আই এগিয়ে চলেছে। শাসকশ্রেণী এর ফলে আতঙ্কিত। ওরা চায়, মানুষ এস ইউ সি আই-এর কথা না জানুক। সাংবাদিকরা আপনাদের ঘরেরই ছেলেমেয়ে। তাঁরা আমাদের অফিসে আসেন। বলেন, 'আপনাদের বক্তব্য শুনতে ভাল লাগে বলে আসি। কিন্তু আমাদের কাগজে, আমাদের টিভি চ্যানেলে আপনাদের কোনও জায়গা নেই।' সংবাদমাধ্যমকে কন্ট্রোল করে পুঁজিপতিরা। তারাই ঠিক করে কোন্ দলকে কেন্দ্রে ও রাজ্যে সরকারে রাখবে, কোন্ কোন্ দলকে বিরোধী আসনে রাখবে। সেভাবেই প্রচার চালাতে নির্দেশ দেয়। ফলে কোন্ দল ঠিক বা বেঠিক তা আপনারা সংবাদপত্র পড়ে বুঝতে গেলে ঠকবেন। এই করে অতীতেও আমাদের দেশের মানুষ ঠকেছে। সেজন্যই বারবার যাতে ঠকতে না হয়, তার জন্য আপনাদের সতর্ক করতে চাইছি।

যেকোন আন্দোলনকে সফল করতে হলে সঠিক বিপ্লবী আদর্শ দরকার, সঠিক বিপ্লবী রাজনীতি দরকার, আর দরকার উন্নত চরিত্র, নৈতিক বল — একথা বলেছিলেন মহান নেতা শিবদাস ঘোষ। তিনি আরও বলেছিলেন, কামান-বন্দুক দিয়ে একটা লড়াইকে ধ্বংস করা যায় না। কামান-বন্দুকের চেয়ে বড় আক্রমণ হচ্ছে, মনুষ্যত্ব মেরে দাও, চরিত্র মেরে দাও — যেটা সবচেয়ে বেশি আজ আমাদের দেশে ঘটছে। এই মেদিনীপুর জেলা ভারতবর্ষে একসময় একটা তীর্থস্থানের মত ছিল। বিদ্যাসাগর এই জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি রেনেশাঁসের ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত সেকুলার মানবতাবাদের পতাকা বহন করেছিলেন। মেদিনীপুরেই ভারতবর্ষের প্রথম বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরামের উত্থান ঘটেছিল। বিদ্যাসাগর এবং ক্ষুদিরামের ঐতিহ্যময় যে মেদিনীপুর, তা গোটা ভারতবর্ষের গর্ব। সেই মেদিনীপুরের আজকে চেহারা কী? গোটা ভারতবর্ষের চেহারা কী? ওরা মদ, জুয়া, সাট্টা, ব্লু-ফিল্ম, নোংরা সিনেমা, নোংরা বইপত্রের স্রোতের মধ্যে গোটা যৌবনকে ডুবিয়ে দিয়েছে। সেই মনুষ্যত্ব নেই, সেই যৌবন নেই। এভাবে নৈতিকতার ক্ষেত্রে একটা ভয়াবহ সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। সিপিএমের এক নেতা, যিনি প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে মহিলাদের নিয়ে নোংরা উক্তি করেন, তিনি নাকি ঐ দলের কর্মীদের আদর্শের ট্রেনিং দেন, চরিত্রের ট্রেনিং দেন। যে দলের নেতার রুচি-সংস্কৃতি এত নিম্নজাতের সেই দলের কর্মীদের কী চরিত্র হবে বলুন! তাই ক্রিমিনালে ভরে গিয়েছে ঐ দল।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, দেশের অবস্থা ফেরাতে হলে যৌবনকে নতুন করে জাগাতে হবে। মনুষ্যত্বকে নতুন করে জাগাতে হবে। তার জন্য চাই আরেকটা আন্দোলন। সে আন্দোলনের সূচনা করেছেন মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। ১১ আগস্ট শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন। ভারতবর্ষের মানুষ ভুলে গিয়েছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে এই ১১ আগস্ট শহীদ ক্ষুদিরাম দিবস প্রতি বছর আমরা উদ্‌যাপন করি। কলকাতায় আমরাই প্রথম ক্ষুদিরামের বিপ্লবী মূর্তি স্থাপন করি। আমরাই ২৩ মার্চ শহীদ ভগৎ সিং দিবস উদ্‌যাপন করাই। আমাদের কর্মীরা শরৎ জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, নেতাজী জয়ন্তী, বিদ্যাসাগর জয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তী মর্যাদার সঙ্গে পালন করে। এই জেলার স্বদেশী

আটের পাতায় দেখুন

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে

প্রথম ঝাড়খণ্ড রাজ্য মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন (এ আই এম এস এস)-এর ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্মেলন গত ২৯-৩১ জানুয়ারি রাঁচিতে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ জানুয়ারি জয়পাল সিং স্টেডিয়ামে প্রকাশ্য সমাবেশে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় এক হাজার মহিলা অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন দাবি সম্বলিত ফ্ল্যাগ-ফেস্টুনে সুসজ্জিত দু'টি মিছিল শহরের দু'টি প্রান্ত থেকে এসে সভাস্থলে যোগ দেয়। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী কমরেড সরলা মাহাতো। সভায় উপস্থিত মহিলাদের স্বাগত

প্রতিনিধি সম্মেলনে সংগঠনের সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী বক্তব্য রাখছেন

জানিয়ে ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রমেশ সরণ। তিনি ঝাড়খণ্ড তথা গোটা ভারতবর্ষের মহিলাদের জীবনের মূল সমস্যাগুলি তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনরত এ আই এম এস এসের ভূমিকার প্রশংসা করেন। প্রধান অতিথি রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ এম কে হাসান তাঁর ভাষণে নানান তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে দেখান যে, মহিলারা কোন দিক থেকেই পুরুষের চেয়ে কম নয়। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী তাঁর ভাষণে বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে মহিলাদের দুই ধরনের শোষণের শিকার হতে হয়। একদিকে পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ ও অত্যাচার, অন্যদিকে পুরুষপ্রধান সমাজের শোষণ ও অত্যাচার। ফলে এই দুই শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে মেয়েদের যদি মুক্তি অর্জন করতে হয়, তবে নারী মুক্তি আন্দোলনকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করার লড়াইয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। এ আই এম এস এসের সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড এইচ জি জয়লক্ষ্মী বলেন, শুধু পার্লামেন্টে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের দাবি তুলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। আমরা কিছু কনসেশন চাই না, আমরা চাই পুরুষের সমান অধিকার, সমান মর্যাদা। এ ছাড়াও প্রকাশ্য অধিবেশনে ওড়িশা রাজ্য কমিটির পক্ষে কমরেড বীণাপাণি দাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য, বিহার রাজ্য কমিটির পক্ষে কমরেড সাধনা কুমারী বক্তব্য রাখেন।

৩০ ও ৩১ জানুয়ারি মারওয়াড়ি ধর্মশালায় প্রতিনিধি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্পাদক কমরেড হেম চক্রবর্তী। তিনি মহিলাদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার সাথে সাথে জনজীবনের অন্য সমস্যাগুলি নিয়েও আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে কমরেড সরলা মাহাতো সভানেত্রী, কমরেড লিলি দাস সহ-সভানেত্রী, কমরেড কেয়া দে সম্পাদিকা, কমরেড সনকা মাহাতো সহ-সম্পাদিকা এবং কমরেড চন্দনা ব্যানার্জী কোষাধ্যক্ষা হিসাবে নির্বাচিত হন। এছাড়া ১৯ জনের কার্যকরী কমিটি এবং ৩৮ জনের কাউন্সিল গঠন করা হয়।

চটকল শ্রমিকদের হুমকি দিচ্ছে পুলিশ

একের পাতার পর

তিনি ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, ইজমা'র চেয়ারম্যান শ্রী বাজোরিয়া বর্ধমানের মঙ্গলকোটে এবং অন্য মালিকরা নানা জায়গায় শ্রমিকদের চালু মজুরির থেকেও কম দিয়ে যে মিলগুলি চালাচ্ছেন, রাজ্য সরকার তা দেখেও নীরব থাকছে কী করে ? তিনি বলেন, চটের একটা প্রধান ক্রেতা হচ্ছে সরকার নিজে। চটের বাজারও ভাল। সুতরাং মালিকদের লোকসানের কোনও প্রশ্নই নেই। চটশিল্প থেকে মুনাফা করে মালিকরা অন্য খাতে তা সরিয়ে নিচ্ছে। তিনি চটকল শ্রমিকদের বঞ্চনার দিকগুলি তুলে ধরে দাবি জানান, শ্রমআইন লংঘনকারী মালিকদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীকে দেওয়া লিখিত স্মারকপত্রে তিনি গ্র্যাচুইটি আইন সংশোধনেরও দাবি করেছেন।

ধর্মঘটী চটকল শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে কমরেড ভট্টাচার্য বলেছেন, শুধু সরকারের ওপর নির্ভর করে থাকা নয়, দাবি আদায় করতে হলে আন্দোলনকে লাগাতার ও বিস্তৃত করতে হবে। মালিকদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় যৌথভাবে ঘেরাও, অবস্থান, এলাকায় এলাকায় যৌথ মিছিল এবং সমস্ত চটকল শ্রমিকদের যুক্ত করে রাইটার্স অভিযানের পথে যেতে হবে। প্রয়োজনে শিল্প ধর্মঘটও করতে হবে। মালিকপক্ষ নানা বিভ্রান্তিকর প্রচার চালিয়ে এবং দালাল মারফৎ শ্রমিকদের সংগ্রামী ঐক্য ও ধর্মঘট ভাঙার যে ষড়যন্ত্র করছে, তিনি সে সম্পর্কে শ্রমিকদের সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ঐক্য ও লড়াই দুর্বল হলে মালিকী শোষণ আরও তীব্র হবে।

১৮ ফেব্রুয়ারি উত্তর ২৪ পরগণায় ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র নেতৃত্বে গৌরীশঙ্কর জুট মিল থেকে জগদ্দল জুট মিল পর্যন্ত শ্রমিকদের পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বাঁশবেড়িয়া জুট মিলের শ্রমিকদের হরতাল ১১০ দিন পার হয়েছে। মালিক চরম ঔদ্ধত্যে কোন আলোচনাতেই আসছে না। এর প্রতিবাদে ১৯ ফেব্রুয়ারি সকালে কয়েক শ শ্রমিক কল্যাণী হাইওয়ে অবরোধ করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। শুধু তাই নয়, পুলিশ তার অধিকারের সীমা অতিক্রম করে হুমকি দেয় যেন ঐ এলাকায় শ্রমিকদের ইউনিয়ন অফিসটি এদিন থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। মালিকদের পাশাপাশি প্রশাসনের এই ঔদ্ধত্য আবার প্রমাণ করে যে, এরাজ্যে পরিপূর্ণ মালিকীরাজ কায়েম হয়েছে।

পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই

পাঞ্জাবে এস ইউ সি আই-এর সাংগঠনিক কাজকর্ম অল্পদিন শুরু হলেও সদ্য সমাপ্ত পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। বাদলাদা বিধানসভা কেন্দ্রে দলের প্রার্থী ছিলেন কমরেড যশবীর কাউর।

সেখানে কর্মীরা প্রথমেই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে নির্বাচনের খরচ যোগাড় করতে অর্থসংগ্রহে নেমে পড়েন এবং পোস্টার, হ্যান্ডবিল ছেপে প্রচার শুরু করে দেন। পথসভা, গ্রাম বৈঠক, এবং বাড়ি বাড়ি প্রচার চলতে থাকে। কমরেড প্রতাপ সামল এবং হরিয়ানার কমরেড রমেশ প্রচার কাজ পরিচালনায় সাহায্য করেন। পরে দিল্লি ও গোয়ালিয়র থেকে কমরেডস্ ভাস্কর ও সুনীলগোপাল উপস্থিত হন এবং ভাষাগত অসুবিধা সত্ত্বেও প্রচারের কাজে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

হরিয়ানা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সত্যবান গ্রামে গ্রামে জনসভায় বক্তব্য রাখেন। তিনি কংগ্রেস, বিজেপি, আকালি, বিএসপি এবং মেকিকমিউনিস্ট সিপিআই-সিপিএমের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখান যে, এই দলগুলির প্রতিটিই পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করছে। তিনি কৃষকজীবনের সমস্যা এবং এসইজেড-এর সর্বনাশা দিক নিয়েও আলোচনা করে বলেন, শ্রমিকশ্রেণীর যথার্থ প্রতিনিধি হিসাবে একমাত্র এস ইউ সি আই প্রতিনিধিই পারে বিধানসভায় শোষিত মানুষের যথার্থ কণ্ঠকে তুলে ধরতে ও তাদের স্বার্থে লড়াই করতে।

জনসভাগুলিতে কমরেড যশবীর কাউর কন্যাভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে দলের আন্দোলনের কথা তুলে ধরেন। এই সংগ্রামের ফলে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়ের বিরুদ্ধে সরকার আইন তৈরি করেছে। শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও নারীজীবনের সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে পার্টি পরিচালিত সংগ্রামের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ যাতে আন্দোলনে ফেটে না পড়ে এবং সংসদীয় চৌহদ্দির মধ্যেই আটকে থাকে এই উদ্দেশ্যে কীভাবে বুর্জোয়ারা তাদের স্বার্থবাহী একটি পার্টিকে সরিয়ে আর একটি পার্টিকে ক্ষমতায় বসায়, পাঞ্জাব রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড অমিন্দর পাল সিং জনসভাগুলিতে তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি দ্বি-দলীয় পাল্টাপাল্টি রাজনীতির বিপরীতে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থবাহী রাজনীতি চিনে নিতে জনগণকে আহ্বান জানান।পাঞ্জাব ও পশ্চিমবাংলার এসইজেড বিষয়ে সিপিএম এবং সিপিআই কীভাবে দুমুখো আচরণ করছে সেটা দেখানোর সাথে সাথে তিনি অকালি দলের চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করে শ্রমিকশ্রেণীর সাচ্চা দল এস ইউ সি আই-কে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। ডি এস ও কর্মীরা নির্বাচনী প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং দিবারাত্র পরিশ্রম করে সমগ্র বিধানসভা এলাকাতেই পার্টির বক্তব্য পৌঁছে দেয়। প্রায় প্রতিটি সভাতেই সাধারণ মানুষ গভীর আগ্রহে পার্টির বক্তব্য শোনেন এবং অনেকেই পার্টি সম্পর্কে আরও জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন ও সমর্থনে এগিয়ে আসেন।

বাসের ন্যূনতম ভাড়া ২ টাকা করার দাবি জানাল পরিবহন যাত্রী কমিটি

পরিবহন যাত্রী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সদানন্দ বাগল ১৮ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

গত ২৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রল ও ডিজেলের মূল্য যথাক্রমে লিটার প্রতি ২ টাকা ও ১ টাকা করে কমানোর ঘোষণা করার পর রাজ্য পরিবহন মন্ত্রী বলেছিলেন, বাস সহ পরিবহনের ভাড়া কমানো হবে। কিন্তু মালিকরা ভাড়া কমাতে অস্বীকার করলে মন্ত্রী আর কোন উদ্যোগ নিলেন না। আবার গত ১৫ ফেব্রুয়ারি পেট্রল-ডিজেলের দাম কমানোর ফলে দু'দফায় মোট লিটার প্রতি পেট্রল ৪ টাকা এবং ডিজেল ২ টাকা কমল। পেট্রল ও ডিজেলের সামান্য মূল্যবৃদ্ধিকে অজুহাত করেই যে সরকার পরিবহনের ভাড়া বাড়ায়, এবার কিন্তু সেই সরকার পেট্রল-ডিজেলের দাম কমা সত্ত্বেও ভাড়া কমানো সম্ভব নয় বলে ঘোষণা করে দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে ১৯৮৫ সালের ৯ই এপ্রিল রাষ্ট্রসংঘের 'কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট'-এ যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে বলা হলেও এ রাজ্যের সরকার সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।

আমরা দাবি করছি, ১) অবিলম্বে বাস ট্যাক্সি সহ পরিবহনের ভাড়া কমাতে হবে, ২) যাত্রী কমিটি সহ একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে ন্যায্য ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে, ৩) পেট্রল-ডিজেলের উপর কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত কর-সেস প্রত্যাহার করতে হবে, পুলিশি হয়রানি বন্ধ করতে হবে, ৪) কিলোমিটারে কারচুপি বন্ধ করতে হবে, ৫) যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং ৬) বাসের ন্যূনতম ভাড়া ২ টাকা ঘোষণা করতে হবে।

কর্ণাটকে মনসান্টো কর্মীদের দাবি আদায়

বেলারি থেকে দশ কিমি দূরে সিরওয়ারে আমেরিকান বহুজাতিক কোম্পানি মনসান্টোর একটি বীজ খামার রয়েছে। এখানে প্রায় ৩০০ জন শ্রমিক বিভিন্ন কনট্রাক্টরের অধীনে কাজ করেন। কিন্তু শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি, ন্যায্য ছুটি, বোনাস ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। এমনকী ওভার টাইম খাটালেও তার বেতন দেওয়া হত না।

স্বাভাবিকভাবেই এই বঞ্চনা শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের জন্ম দেয়। তাঁরা ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতৃত্বে গত ৮ জানুয়ারি ফ্যাক্টরি অফিসের সামনে ধর্ণায় সামিল হন। ৪৮ ঘণ্টা ধরে অফিসের সামনে অবস্থান চলে। আন্দোলনের চাপে অবশেষে এই প্ল্যান্টের অফিসার হায়দরাবাদ থেকে ছুটে আসতে বাধ্য হন এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসেন। কর্তৃপক্ষ প্রভিডেন্ট ফান্ড, ওভারটাইম বেতন, বোনাস এবং গ্র্যাচুইটি প্রভৃতি দেওয়ার দাবি মেনে নেন। শ্রমিকদের নিয়মিতকরণের দাবিও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিদের আশ্বাস দিয়েছেন। প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর কর্নাটক রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে সোমশেখর।

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই ন্যায্য দাবি আদায় শ্রমিকদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করে। তারা খামারে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতৃত্বে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

গণছুটিতে কর্মচারীদের ব্যাপক সাড়া

২২টি সংগঠন নিয়ে গঠিত 'যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ' -র ডাকে ১৫ ফেব্রুয়ারি এ রাজ্যের সরকারি-আধাসরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা কো-অর্ডিনেশন কমিটির একাংশের প্রবল বাধা ও হুমকিকে উপেক্ষা করে ঐক্যবদ্ধভাবে মাথা তুলে দাঁড়ালেন। মহাকরণ, নবমহাকরণ সহ জেলায় জেলায় ৫৫-৬০ শতাংশ কর্মচারী তাঁদের ১০ দফা দাবিতে 'গণছুটি' নিয়ে সিপিএম সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক স্বার্থবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। রাজ্যের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও কার্যত বন্ধ ছিল। সরকারের পৃষ্ঠপোষক কোঅর্ডিনেশন কমিটির সমর্থকরাও নেতৃত্বের ফতোয়াকে উপেক্ষা করে এই গণছুটিতে অংশ নেন। চাষীর জমি জোর করে কেড়ে নিয়ে দেশি-বিদেশি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার হন। 'যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ'র আহ্বায়ক ফটিক দে এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গণছুটিতে অংশগ্রহণকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন — রাজ্য সরকার এই দাবিগুলি না মানলে আগামী দিনে ধর্মঘটের মতো আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ অ্যাকশন (জেপিএ)-এর সহসভাপতি ও রাজ্য কোঅর্ডিনেটর বিমল জানা বলেন — সিপিএম ফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় কিংবা অন্যান্য রাজ্য সরকারের মতোই দেশি-বিদেশি মালিকদের স্বার্থে এ রাজ্যের বিশ্বায়নের নীতিকে কার্যকর করছে আর আর্থিক সঙ্কটের অজুহাতে কর্মচারীদের ন্যায্য প্রাপ্য দিচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার ও ১৭টি রাজ্য সরকার ৫০ শতাংশ ডি এ মূল বেতনে যুক্ত করলেও এই রাজ্যের সিপিএম সরকার তা না করে এক একজন কর্মচারীকে প্রতি মাসে প্রতি হাজারে ৩৪০ টাকা হিসাবে বঞ্চিত করে ডিসেম্বর '০৬ পর্যন্ত প্রায় ৬০/৭০ হাজার টাকা বঞ্চিত করেছে। ২ লক্ষাধিক শূন্যপদে নিয়োগ হচ্ছে না। কর্মরত অবস্থায় মৃত অথবা অক্ষম কর্মীর পোষ্যের চাকুরির সুযোগও নেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আজও মাসিক ১৭৫ টাকা বেতনে ওয়াটার ক্যারিয়ার, সুইপাররা এবং মাত্র ৫০ টাকা বেতনে কমিউনিটি হেলথ গাইডরা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। হাজার হাজার অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিত করা হচ্ছে না। এই সরকার চাইলেই বোনাস আইন সংশোধন করে সকলকে ন্যূনতম ৮.৩৩ শতাংশ বোনাস দিতে পারে, আধা সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে ৮ - ১৬ - ২৫ বছরের ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিমের সুযোগ দিতে পারে, তা তারা দিচ্ছে না। এই সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপ যে শ্রমিক কর্মচারীরা মেনে নেবে না, ১৫ ফেব্রুয়ারির সফল গণছুটি সেটাই দেখিয়ে দিয়ে গেল।

পুরুলিয়ায় মিছিল, বিক্ষোভ

অন্যান্য জেলার মতো পুরুলিয়া জেলাতেও গণছুটির সমর্থনে দপ্তরে দপ্তরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলবদ্ধ প্রচার ও ব্যাপকহারে প্রচারপত্র বিলি করা হয়। দাবির সমর্থনে কর্মচারীরা 'গণছুটি'র সাফল্য কামনা করেন। এই কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য সরকার মদতপুষ্ট সংগঠন উঠে পড়ে লাগে। এমনকী প্রশাসনের একাংশকে এই কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। কর্মচারীদের একটা বিরাট অংশ সমস্ত প্রকার ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে ১৫ ফেব্রুয়ারি 'গণছুটি' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। পরে কর্মচারীরা পুরুলিয়া শহরে মিছিল করেন এবং জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান।

১৫ ফেব্রুয়ারি গণছুটির দিন রাইটার্সের ছবি

এস ই জেড-এর বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় আন্দোলনের লক্ষ্যে ওয়ার্ধায় কনভেনশন

গত ৯ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধার সেবাগ্রামে এস ই জেড এর বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বিশেষ আমন্ত্রিত হিসাবে এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল, এস ইউ সি আই নাগপুর জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড মাধব ভোন্ডে এবং সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির বিশিষ্ট সদস্য কমরেড দীপক সিংহ উপস্থিত ছিলেন।

৯ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী সমাবেশে সভাপতি ছিলেন ডঃ রাকেশ রফিক, প্রধান অতিথি ছিলেন ঝাড়খণ্ড আদিবাসী উন্নয়ন সংঘের চেয়ারম্যান ডঃ বি ডি শর্মা, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী মেধা পাটকর এবং ডঃ ঠাকুর দাস বাগ।

এই সভায় প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে প্রথম বক্তব্য রাখেন কমরেড সদানন্দ বাগল এবং কমরেড দীপক সিংহ।

আলোচ্য বিষয় ছিল 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল'। এই অধিবেশনে মহারাষ্ট্র, দিল্লি, ঝাড়খণ্ড, ছত্রিশগড়, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তিনদিনের ৬টি অধিবেশনেই কমরেড সদানন্দ বাগল, কমরেড মাধব ভোন্ডে এবং কমরেড দীপক সিংহ বক্তব্য রাখেন।

এস ইউ সি আই সেখানে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলনের চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল যা প্রতিনিধিদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। সভায় এস ই জেড ছাড়াও, আন্দোলন কীভাবে পরিচালিত হবে, হিংসা, অহিংসা, সত্যাগ্রহ, এন জি ও'র ভূমিকা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রশ্নে এস ইউ সি আই-এর বক্তব্য প্রতিনিধিদের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তাঁরা পার্টি আয়োজিত বুক স্টল থেকে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনাবলী সংগ্রহ করেন। অনেকেই দল সম্পর্কে আরও জানবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সমাপ্তি অধিবেশনে মেধা পাটকর পুঁজিপতিদের জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানান।

এ আই ডি এস ও'র আন্দোলনের চাপে কেরালার সিপিএম সরকার যৌনশিক্ষা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে।

(বিস্তারিত আগামী সংখ্যায়)

জনগণের ট্যাক্সের টাকায় টাটার জমি পাহারা

সিঙ্গুরে টাটার জন্য জমি পাহারা দিতে গত ডিসেম্বর মাসেই রাজ্য সরকার প্রায় ২৯ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। পুলিশদের ক্যাম্প তৈরি, হোটেল খরচ, বিদ্যুৎ বিল সহ নানা জিনিসপত্র কিনতে এই টাকা খরচ হয়েছে। পরবর্তী দেড় মাসে এই পরিমাণ আরও বেড়েছে। কোন্ খাতে কত খরচ, তার যে হিসাব হুগলি জেলা পুলিশ সরকারকে দিয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

১। হোটেল বিল	৬,৬৯,৬০০ টাকা
২। বিদ্যুৎ বিল	৩৪,৪০০ টাকা
৩। বালতি, মগ, জগ	৬১,৫০০ টাকা
৪। জল, শৌচাগার, মাঠ পরিষ্কার	১৪,১৩,০০০ টাকা
৫। ডেকরেটর	১,০০,০০০ টাকা
৬। বিদ্যুৎ (অস্থায়ী ঠিকাদার)	৯৫,০০০ টাকা
৭। বেড়া ঘিরে পুলিশের বসার জায়গা নির্মাণ	৪,৬৫,২৫০ টাকা
মোট	২৮,৩৮,৭৫০ টাকা

(সূত্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ১১-২-০৭)

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাই অপরাজেয় শক্তির উৎস

ছয়ের পাতার পর

আন্দোলনের প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় বিমল দাশগুপ্ত মহাশয় অবহেলিত অবস্থায় পড়েছিলেন। আমরা পশ্চিমবাংলার জনগণের কাছে আবার তাঁকে নিয়ে গিয়েছি। এই শহরের নাগরিকদের সহযোগিতায় তাঁর একটা মূর্তি এখানে স্থাপিত হয়েছে। এগুলো এমনি এমনি আমরা করি না। আমরা বহন করছি কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি অমূল্য শিক্ষা। তিনি বলেছেন, অতীত যুগের বড় মানুষদের কাছ থেকে, বিপ্লবীদের কাছ থেকে শেখো। আজকের দিনে মার্ক্সবাদী বিপ্লবী হতে হলে পুরনো দিনের বড় মানুষদের থেকে, পুরনো দিনের বিপ্লবীদের থেকে শিখতে হবে। এ একটা আন্দোলন। এটা আমাদের দলের একটা জীবন্ত সাধনা।

আমাদের ছেলেমেয়েরা পুলিশের মার খায়, রক্ত ঝরায়। আমাদের ২৮ জন নেতা-কর্মী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। আমাদের ১৪১ জন নেতা-কর্মীকে সিপিএম খুন করেছে। অন্য কোন দলের এত ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আমাদের ৩৪৩ জনের বিরুদ্ধে মার্ডার কেসের মামলা চলছে এবং সমস্ত মিথ্যা মামলা। কিন্তু সিপিএম পারেনি আমাদের নত করাতে। এই শক্তি আমাদের কর্মীরা কোত্থেকে পায়? সরকারের, এমএলএ-এমপি'র জোরে? প্রচারের ব্যাকিং-এ? না, এ হচ্ছে বিপ্লবী আদর্শের শক্তি। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার শক্তি। এটাই আমাদের শক্তির উৎস।

তাই আপনাদের বলতে চাই, এই আন্দোলন দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা চালিয়ে যাব। এর জন্য চাই এলাকায় এলাকায় গণকমিটি, ভলান্টিয়ার বাহিনী। যেসব জায়গায় কৃষিজমি দখল হচ্ছে না, সেখানেও অন্যান্য দাবিতে এই গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে আপনারা গড়ে তুলুন। আর চাই চরিত্রের সাধনা। আর ভোটের রাজনীতির স্বার্থে যারা আন্দোলনে আছে, তাদের সম্পর্কে আপনারা সতর্ক থাকবেন। নিচুতলায় যে গণকমিটি হবে, তাতে সিপিআই-সিপিএম-কংগ্রেস-তৃণমূল সমস্ত দলের লোকজন আসুন। যাঁরা এই আন্দোলনের পক্ষে আমরা তাদেরই চাই। আমরা বলব, অন্ধের মত কাউকে মানবেন না। আমাদেরও বিচার না করে বিশ্বাস করবেন না। গণকমিটি বসে বিভিন্ন দলের কর্মসূচি-নীতি নিয়ে আলোচনা করবে, বিচার করবে। তার ভিত্তিতে তারা কার্যক্রম ঠিক করে আন্দোলন করবে। সমস্ত জায়গায় এই গণকমিটিগুলি এবং ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা দরকার। এই আহ্বানটা দলের তরফ থেকে আমি আপনাদের সামনে রাখছি। আবার আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এই বিশ্বাস রাখি যে, এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য, সফল করার জন্য আপনারা সর্বাত্মক সাহায্য করে যাবেন। আর আমাদের দলের বক্তব্য যদি সঠিক মনে করেন, আপনারা যাঁরা প্রবীণ তাঁরা সহযোগিতা করবেন, যাঁরা যুবক তাঁরা এগিয়ে আসবেন, যাতে আমাদের দল আরও শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

গণদাবী সম্পাদকীয় দপ্তরের নতুন ফোন নম্বর
২২২৭১০১৭

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১০১৭, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in